রবীন্দ্র-মননগীতির আলোকে রামমোহন

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সাহিত্যতীর্থ
৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
২২০তম রামমোহন রায় জন্মবার্ষিকী
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

প্রকাশক
সাহিত্যতীর্থ
৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীমা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেশন
৩৩বি মদন মিত্র লেন
কলকাতা ৬

প্রয়াত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়



প্রয়াত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগল বরেণ্য স্মৃতির শ্রদ্ধা-স্মরণে

ভূমিকা

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—অতীত শতাব্দীর বুকে অনুভূতির অভিযাত্রী।

মানবপূজারীর প্রতি মানবতার প্রণতি।

প্রতি বছর জন্মদিনে আর সময়ে-সময়ে যথার্থ সময়োপযোগী করে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রণতির মনই পুষ্পাঞ্জলির মানসিকতায়।

মাঘ ১৩৯৮এর 'কথাসাহিত্য' মাসিকের পঞ্চম পৃষ্ঠায় লেখা হয় -'তবে স্বয়ং সম্পাদক যেভাবে রবীন্দ্রালোকে রামমোহনকে তুলে ধরেছেন—সেজন্য আমরা তাঁর 'কেনা' হয়ে গেলাম।' কারণ 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৯৮ অষ্টত্রিংশং বার্ষিকীর পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্র-মননে ও গীতিকবিতার আলোকে রামমোহন' শিরোনামার মধ্যে 'রামমোহনের ভারত-ভাবনা', 'রবীন্দ্র-মননে রামমোহন,' 'গীতিকবিতার আলোকে রামমোহন,' 'নবজাগৃতির আলোকে রামমোহন,' 'স্বদেশীয় মানসে রামমোহন' একত্রিত। তবে প্রথমে 'রামমোহনের ভারত-ভাবনা' রচনা হয় 'দৈনিক বসুমতী'র বিশেষ পৃষ্ঠার জন্যে। যা বিশিষ্ট সান্নিধ্যে উজ্জ্বল-প্রকাশ। 'রবীন্দ্র-মননে রামমোহন' প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ 'রামমোহন দ্বিশত জন্মবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকা' রামমোহন লাইব্রেরী প্রকাশিত ১৯৭২ সময়ে। 'গীতিকবিতার আলোকে রামমোহন' দুটি সংখ্যায় প্রকাশ লাভ করে 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'য়। আর 'স্বদেশীয় মানসে রামমোহন' প্রকাশিত 'প্রবাসী' মাসিকে। 'নবজাগৃতির আলোকে রামমোহন' প্রথম 'সাহিত্যতীর্থ' এই বার্ষিকীর জন্যে রচিত এবং 'অপ্রকাশিত রচনাবলীর রামমোহন' ও 'রামমোহন-ভাবনার ক্রমবিকাশ' এবার সংকলিত 'রবীন্দ্র-মননগীতির আলোকে রামমোহন' গ্রন্থেই প্রথম।

আজ সপ্তরথী বেষ্টিত রাজকীয়-জনের প্রতি প্রণতিপর্ব মননশীল পাঠকের দরবারেই উপস্থিত।

মনীষার প্রতি মননশীলতার মনোনয়ন। কারণ তিনি মন ও মননের সঙ্গে সঙ্গীবিতই। তাই আগামী প্রজন্মের হাতে বর্তমান প্রজাতির এই তো উপস্থাপনা 'রবীন্দ্র-মননগীতির আলোকে রামমোহন'।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

॥ সূচীপত্র ॥

রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের বই

প্রবন্ধ : 'রবীন্দ্র-মননগীতির আলোকে রামমোহন', 'বঙ্গসাহিত্যে বনফুল', 'স্বদেশ সাহিত্য ও মননশীলতা', 'ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ', 'কলকাতা কল্পতরু', 'আধুনিক কবিতা ও সুধীন্দ্র-কবিমানস'

কবিতা : 'মিষ্টিমন', 'আকাশ পিপাসা', 'ললিত লাবণ্য', 'পুষ্পিত প্রকাশ ও আরো অম্লান'

কাব্যনাট্য : 'রামায়ণ-মহাভারত ও আজ', 'যুদ্ধজিজ্ঞাসা সুভদ্রা ও মিনি'

উপন্যাস : 'ইউকালিপটাস', 'জীবনই সুবর্ণরেখা', 'দ্বিতীয় দিগন্ত', 'শুধুই চঞ্চল', 'প্রথম ফাল্গুন', 'সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ'

গল্পগ্রন্থ : 'শাল্মলী'

নাটক : 'এক পালকের পাখি'

সম্পাদনা : 'ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ', 'কবি করুণানিধান স্মরণিকা', 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা', 'কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণিকা', 'সাহিত্যতীর্থ'

রবীন্দ্র-মননগতির আলোকে রামমোহন

১

রামমোহনের ভারত-ভাবনা

ব্যক্তিসত্তার সমসূত্রে বিশ্বসত্তার বিকাশ—ভারতপথিক রামমোহন যেমন সত্যি, তেমনি তিনি বিশ্বপথিকও। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন রাজা রামমোহনকে ভারতপথিক। কিন্তু তাঁর মধ্যে মহৎ ও মহীয়ান, উদার ও উচ্চমার্গের যে পরিচয় আমরা সবিশেষ অনুসন্ধানে পেয়েছি, তা বিশ্বপথিক রামমোহনেরই।

একদিকে রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে তৎপর, অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীকে আধুনিকতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনায় অগ্রণী দেখতে চাইছেন।

রামমোহনের মানসিকতার মধ্যে তাই অন্ধকারের কুসংস্কার-মুক্তি ও নতুন আলোককে বরণের অভিলাষ যেমন জাগ্রত, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম, প্রাচীন ও আধুনিকের মিলন আকাঙ্ক্ষা। একটা সমন্বয়ী জীবনদর্শনে বিশ্বাস। একেশ্বরবাদী মন আবার বিশ্বপরিক্রমায় স্বজন এবং তিনিই আবার নব ভারতের অগ্রদূতীয় উদগীতিকার, মহান উজ্জীবনের বাণীদূত।

তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা এবং চিন্তাচেতনার যে বিস্তার, তা তাঁর সমকালের ভারতবর্ষে অভাবনীয়। তিনি যেন দেশ ও জাতির, সমাজ ও রাষ্ট্রের, ভাবরাজ্যের ও ভাষা সাহিত্যের জয়শঙ্খ বিঘোষক ভগীরথ।

একটা নির্জীবতা থেকে সজীবতায় উত্তরণ ঘটানো, একটা কর্মবিমুখতা থেকে সকর্মে সক্রিয় করে তোলার অনুপ্রেরণাই রাজা রামমোহনের জীবনী ও বাণী। তাঁর জীবনব্যাপী ভাবনায় ছিল সচল, সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠার সাধনা।

পৃথিবীতে যখন গ্রীষ্মের দাবদাহ চলে, মানুষের মনে ত্রাহী ত্রাহী ধ্বনির সম্ভাবনা ঘটে। তখনই ঋতু পরিক্রমায় দেখা যায় পরবর্তী প্রকৃতির লীলায় বর্ষা ঋতু। ভারতবর্ষের দমবন্ধ হওয়া আবহাওয়ায় জন্ম নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। মনে হয় মহাভারতের কাহিনী। কংসের কারাগারে জন্ম নিয়েছিলেন কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সুদর্শন চক্রধারী শ্রীবিষ্ণু। আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে সংস্কার-মুক্তির জয়রথ হাঁকিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তেমনি রাজা রামমোহন রায়। এসেছিলেন নবভারত গঠনের স্বপ্ন নিয়ে আর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মিলনসূত্রের সোনালীরেখার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে।

বৈদিক ভারতের ঋষিরা একচ্ছত্রে সবার আসন পাতার কথাই বলেছিলেন। শুনিয়েছিলেন বিশ্বের অমৃতের পুত্ররূপে আশা ও আশ্বাসের উদাত্ত আহ্বান। কল্যাণ ও শুভেচ্ছা, মঙ্গল ও শান্তির বাণী ছিল উপনিষদের। যার মধ্যে সর্বজীবের, সর্বতোমুখী সুকল্যাণবোধ। যার মধ্যে দেশের এক গণ্ডীর কথা নেই, শুধু কোনো সময়েরও নয়। অথচ দেশ ও সময়কে নিয়েও সর্ব দেশের ও সর্ব সময়ের বাণীই

উচ্চার্য। ব্রহ্মময় জগৎ বা ব্রহ্মই আরাধ্য। অর্থাৎ সৃষ্টিময় স্রষ্টাকেই সদা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদেয়।

রাজা রামমোহন রায় সেদিন আত্মীয় সভায় প্রার্থনায় বসেছিলেন সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টির শ্রদ্ধা নিয়ে আবার ভারতের আত্মার যথার্থ বাণীকে বুকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেই। রচনা করেছিলেন অসংখ্য বাণীর ব্রহ্মসংগীত আর উপাসনায় আত্মার পরিশোধনে নিয়োজিত হয়েছিলেন ব্রহ্মলোক বিহারে। ব্রাহ্মসমাজ গঠন হয়েছে তাঁরই মৌল মতাদর্শ ই শীর্ষভাগে অনুসরণে। এক সময় এই সমাজভুক্ত মানুষরা দেশ ও জাতির সকল দিকের আধুনিকতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ হয়ে ওঠেন। এঁদের এই যথার্থ আধুনিকতার বোধটি এমন সহজেই সঞ্চারিত হয় রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত মত ও মননে, আশা ও আদর্শে, চিন্তা ও চেতনায়।

বৃটিশ ভারতে খণ্ড-বিখণ্ড ছিন্নবিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রশাসনের অবসান ঘটতে আরম্ভ করলো। অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের আদলে বৃটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন রায় রাধানগর থেকে চলে এলেন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। তাঁর কলকাতা বসবাসের উল্লেখযোগ্য প্রধান তিনটি স্থানের মধ্যে ধর্মতলা, জোড়াসাঁকো এবং মানিকতলায়। তার পর বিলেতী প্রবাসে জীবনাবসান। সুদূর বৃস্টল শহরে স্মৃতিসৌধ নির্মিত রয়েছে। শ্বেত প্রস্তরে শুভ্র-সমুজ্জল!

স্মৃতির সুরভিতে উজ্জীবিত তবুও রাখতে হবে রাজা রামমোহন রায়কে। এই স্মৃতি-জাগৃতি পিতৃ-তর্পণের মতো অবশ্যকরণীয়। নবজাগরণের রোমাঞ্চিত আলোকে যিনি অন্ধকারের বুকে ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছেন, যিনি ঘুমন্ত জাতির জীবনে প্রাণবন্ত প্রেরণার উৎসমুখ উন্মোচন করেছেন, যিনি সমাজের শোষণের ও পেষণের হাত থেকে নারীজাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অবকাশ এনে দিয়েছেন, তিনি বারবার পিতৃঋণ স্বীকারের মতো শ্রাদ্ধ-তর্পণীয় শ্রদ্ধার পরমার্তিতে।

ঋণ-স্বীকার ঋণীর গৌরবের। রাজা রামমোহন রায় জাতিকে অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। এখানে পরিশোধের কথাই উঠে না—শুধুই স্মরণ, মনন ও বরণ। শুধু গর্বের সঙ্গে বলা—বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় আমাদের এই ভারতবর্ষে যিনি ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যে মাঙ্গলিক ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যিনি ভারতবর্ষের রুদ্ধ দ্বারগুলি উন্মুক্ত করে বিশ্বের আধুনিকতম জ্ঞানের আলোরই তো অনুপ্রবেশ ঘটান। অন্ধকারের মধ্যে তিনিই তো ছিলেন উৎসারিত আলো।

অথচ একদিন আমাদের সমাজে রামমোহনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করার মন ও মানসিকতার অভাব ছিল। সেদিন তাঁকে সঠিক মূল্যে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তাঁকে নবগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসমিতির সদস্যপদ থেকেও তাই পদত্যাগ করতে হয়। তাঁকে নিয়ে যদি সেই সমিতি কাজ করেন তা হলে সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজের জমিদারবৃন্দ অর্থসাহায্য করতেই অনীহা জানান। তাই তাঁকে বাদ দিয়েই গড়ে ওঠে সেই কর্মসমিতি। একটা বেদনার ও লজ্জার ইতিহাস সেদিন রচিত হয়।

তবে সে ইতিহাস আজ রূপান্তরিত, আমরা সোচ্চারে বলছি শিক্ষাক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অমর অবদানের কথা। বলছি সেই ভূগোলের বুকে দাঁড়িয়ে যে ভূগোলে একদিন রাজা রামমোহন রায় বিচরণ করেছিলেন।

সমকালীনরা সমকালের বৃহৎ প্রতিভাকে মহৎ মানসিকতাকে একেবারে প্রথম ছোঁয়ায় ঠিক ধরতে পারেন না। কালের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনার আঁচড় লাগেই এবং তাই সোনার জলের রেখায় লেখা আজ ভারতপথিক তথা বিশ্বপথিক রাজা রামমোহন রায়ের নাম। তিনিই তো প্রথম বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি মহৎ চিন্তারই বীজাকারে অঙ্কুরোদ্গমের প্রতীক্ষায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্বের সে এক মিলনযজ্ঞের যাজ্ঞিকতা।

জাতীয় জীবনের অমর অধ্যায়ের অন্যতম রূপকার রাজা রামমোহন রায়। সত্যে ও কর্মোদ্যমে অবিচল আগ্রহ। অভাবনীয় অভিনিবেশ। রামমোহন রায়ের জীবনে এটি বারবার দেখা গিয়েছে। তাঁর মতকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন না করে শুধু প্রাচীন সংস্কার বলে বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয় নি। সংস্কৃত ভাষাকে বরণীয় করেছেন কিন্তু প্রাচীন সংস্কারসর্বস্বকে নয়। অযৌক্তিকতা অসহ্য তাঁর। তিনি আবাল্য যুক্তিশীল। নিজের নীতিকে স্থির রেখে অগ্রসর হয়েছেন। এমন-কি তাঁর পারিবারিক বিরূপতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। আবার দেশের স্বার্থে সুদূর বিলেতে গিয়েছেন নিজের শরীর সুখ ও সমাজসংগঠন সাময়িক স্তিমিত রেখে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন প্রাধান্যভুক্ত হয়েছে। জানেন আগের কাজ আগে। সময়ের কাজ সময়ে।

বাংলা ভাষায় বাঙালীর কাজে ভাষারীতিতে গদ্যে বক্তব্য রাখাই প্রয়োজন তাই তিনি সেই ভাবেই প্রচারপত্র বিলি করেছেন। সাধারণ এবং অসাধারণ, লঘু এবং গুরু বক্তব্য বিষয়কে বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গদ্য নিবন্ধও রচনা করেন। বাংলায় ব্যাকরণ প্রয়োজন? গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করে গেলেন।

খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে যাচ্ছেন শিক্ষিত সমাজ—এই দেখে তিনি নতুন করে ভারতীয় ধর্মের মৌল ভাবধারা প্রচারেও অগ্রণী হলেন। সতীদাহ অসহ্য এই সত্যজগতে, রামমোহন এগিয়ে গেলেন দরদী মন নিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে। অবশ্য রাজদণ্ডে ন্যস্ত তখন ন্যায়দণ্ড। তাই ইংরেজ দরবারের আনুকূল্যে সতীদাহ প্রথার রদ হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের অন্তরের আর্তি এই সতীদাহ প্রথার প্রতিরোধে অবশ্যই অবিস্মরণীয়। তিনি ভারতবাসীর মানসিকতার পরিবর্তনই প্রার্থনায় রেখেছিলেন। নারীর জীবন্ত দগ্ধ হওয়া স্বামীর চিতায়—এ যে ধর্মের নামে সামাজিক নীচতায় অধার্মিকতা—সে কথাই রামমোহনের গলায় সোচ্চার ছিল।

সমাজকে নরনারীর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশে দেখার উদার যে দৃষ্টি তা রামমোহনের ভাব ও ভাবনায় অতুলনীয়। বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার যেমন চাইলেন রামমোহন, তেমনি ব্রহ্মোপাসনায় আত্মনিয়োজিত করতেও আহ্বান জানালেন। আমরা দেখি রামমোহনের মধ্যে সর্বতোমুখী উন্নয়নের মানসিকতা। তিনি সার্থক

মনুষ্যজীবন যাতে যাপিত হয় তারই পথনির্দেশক। পাশ্চাত্যের নতুন আলোকে তখন ভারতীয় সমাজ উদ্‌ভ্রান্ত। একদিকে ইংরেজের ব্যর্থ অনুকরণ অন্যদিকে প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য। এই উভয়বিধ অসামঞ্জস্যের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এলেন সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের বাণীমূর্তিরূপে। তিনি ভারতীয় মৌল ভাবনাকে গ্রহণ করলেন আবার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচেতনার আলোকে মানসিকতাকে মননশীলও করলেন। যুক্তিবাদের ভিত্তিভূমিকেই রামমোহন মৌলভাবে তাঁর সমকালের মন ও মননে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে গিয়েছেন। তাই ভারতে ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণের যে প্রধান লক্ষণ—যুক্তিবাদী মানসিকতা—তারও ছিলেন অগ্রনায়ক রাজা রামমোহন রায়ই।

তাঁর নবীন চেতনার আলোকে ভারতীয় সমাজ-ভাবনা ও ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ভিত্তিভূমিতে ভূকম্পন জাগে। অগণিত না হলেও কিছু মনে—কিছু কোণে—কিছু বনে আলোড়নের দোলা লাগে। আলোড়িত হয় অন্তর ও বাহির। এক কথায় একটা স্থিতিশীলতার বুকে গতিশীলতার চাঞ্চল্য জাগে। মন মুক্ত হয় মুক্তির যুক্তি-চিন্তার জগতে, যুক্ত চেতনার চৈতন্যের ক্ষেত্রে।

আকার ও নিরাকার—আরাধনার দুধারার মধ্যে রামমোহন রায় 'নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর ধ্যান মন্দিরে নিরাকারের। প্রার্থনায় ব্রহ্ম উপলব্ধি, ধ্যানাত্মায় আনন্দে স্থিতি। রূপ থেকে অরূপে নয়, সোজাসুজি অরূপে অবস্থিতি। তিনি ইসলাম ও খৃস্টের ধর্মমত অনুধ্যান ও অধ্যয়ন করেন। এমন কি মূল হীব্রু ভাষায় 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' পাঠও করেছিলেন—হীব্রু ভাষা শিক্ষা আগেভাগে করে নিয়ে। তন্ত্রসাধকের সংস্পর্শের কথা মহৎ মানুষের অমৃত স্মৃতির তহবিলে জীবন্ত। আর তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুলের বৈষ্ণব-শাক্তের সমন্বয়ের কথা রাজার মূল-জীবনীরই বিষয়ভুক্ত। এই সর্বদিকের জীবনদর্শনে রামমোহন-জীবনীই সমন্বয়ী ধর্মদর্শনের মিলনভূমি। তিনি ধর্মসমন্বয়েরই প্রবক্তা ও প্রদীপ্তপুরুষ।

আমাদের আর্য ঋষিদের ধ্যান ও প্রার্থনা আর দেশ-বিদেশের নানা ধর্মমতের উপাসনারীতি নিয়ে তাঁর প্রবর্তনা হয় একেশ্বরবাদীর উপাসনা মন্দির। এই দেশেরও সীমা ছাড়িয়ে অন্যদেশের মাটিতে তখন 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি'ও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। রামমোহনের নিরাকার উপাসনাপদ্ধতি একেশ্বরবাদ ভিত্তিতে ভারত মানসের সঙ্গে বিশ্বমানসেও উদ্ভাসিত ছিল। রামমোহন ভারত-ভাবনায় এই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন নয় প্রত্যাবর্তন ঘটালেন একেশ্বরবাদী সাধনায়। অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদী মতাদর্শের পুনঃপ্রর্বতক ও পুনর্জাগরণকারী এক অগ্রগামী প্রতিভা।

আর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই বাণীবক্ষে সর্বধর্মের মিলনতীর্থ ভারতভূমি। ভারতের সব ধর্মীয় ধারার পথপরিক্রমা করে ভারতপথিক আবার পৃথিবীর তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্বেও মন দিয়ে তিনি হয়েছিলেন বিশ্বপথিক।

ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে পরমত-সহিষ্ণু এবং একান্ত উদার।

রাজা রামমোহন রায় সেই উজ্জ্বল মতকে নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি সামাজিক, ধার্মিক ও রাষ্ট্রিক—সর্ব বিষয়েই এক মোহ মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের উচ্চকোটিতে অবস্থিতি উপলব্ধি করেই তিনি দিকে-দিগন্তে পশ্চিমের দেশে-দেশে যে আলোকদূতের আবির্ভাব লক্ষ্য করছিলেন তাঁদেরও মতন ঘরের কাজে শুভ-মতাদর্শ ই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। কারণ সর্বদা তিনি বিশ্বাস করতেন ঘরের আলো আর পরের আলো মিলে বড় ঘরের আলোকোৎসব সম্ভব।

তিনি ভারত-ভাবনায় যা জানতেন তা বড় ঘরের আলোকোৎসব।

২

রবীন্দ্র-মননে রামমোহন

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই ভারতীয় মানসিকতা রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত মনীষার সত্যবোধে উদ্বোধিত হওয়ায় আলোকপ্রাপ্ত হয় আর উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথের শুচিস্নিগ্ধ সৌন্দর্যদৃষ্টির আলোকে বিশ্ববোধে উজ্জীবিত হয় ভারত-মানস। তপোবনের ঋষিদের প্রাচীন ভারতে উদ্গীত—'শোনো শোনো বিশ্ববাসী' বলে যে বাণী যে উচ্চারণ যে উদাত্ত আহবান তা 'অমৃতের পুত্র'-বোধে জাগৃতির তীর্থে উপনীত করে। রামমোহনও ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করে সেই উপলব্ধির উচ্চকোটিতে যথার্থই উপবিষ্ট ছিলেন কিনা সে নিয়ে যত দ্বিধা যত সংশয় তার সমূলে নিরসন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি 'ভারতপথিক' বলেছেন রামমোহনকে। ভারতের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে রামমোহন নবধারায় নবীন জাগৃতির চেতনায় বিশ্ববোধের আলোকে চৈতন্য-ভূষিত করলেন। তিনি ক্ষুদ্রতা নীচতা সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে বৃহৎ উদার ও মুক্ত মানসিকতার ভাবমূর্তি রচনা করলেন। তাঁর বান্ধব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পেলেন পরিচ্ছন্ন কর্মের শিক্ষা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেলেন একেশ্বরবাদের দীক্ষা আর রবীন্দ্রনাথ পেলেন ভারত-ভাবনার ঐশ্বর্য এবং বিশ্ববোধের ইংগিত।

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'—

গেয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ কারণ 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' যে বাণী সে তো বিশ্বমৈত্রীর বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী ভাবনায়; মধ্যযুগে বিনষ্ট হয়েছিল কিন্তু আবার জাগৃতির চৈতন্যোদয় আসছে 'দিন আগত ঐ'। এই আশা ও আশ্বাসের বাণীমন্ত্রিত

রবীন্দ্র-সৌন্দর্য মুগ্ধ নান্দনিক দৃষ্টিতে এক যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন যেমন ভাবের অনুরণন তুলছে তা স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবনীয়।

জোড়াসাঁকো অঞ্চলেই কলকাতার প্রথম বসতি রামমোহনের। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠবে এমন সূচনা দ্বারকানাথের বিবিধ ধারার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে। বিদেশী শাসন ও শাসক সমাজের সঙ্গে অনেক কাজের সংযোগে তখন রামমোহনও দ্বারকানাথের মতো যুক্ত ছিলেন। তাঁদের সৌহার্দের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' গ্রন্থে। তিনি লিখছেন—'রামমোহন যখন দেখা করিতে আসিতেন, তখন নিশ্চয়ই পূজা সাজ হইয়া যাইত, হয়তো জপ করিতেছেন তাহাই উঠাইয়া রাখিয়া রামমোহনের সঙ্গে কথা কহিতেন তাঁহার সঙ্গে নিশ্চয়ই অধিকাংশ ধর্মালাপই হইত—জপ অপেক্ষা তাহা মূল্যবান বিবেচনা করিয়াই এইরূপ করিতেন। যাহাই হউক মোটের উপর ইহাই বলিতে পারি যে, দ্বারকানাথের মত কর্মঠ ও বদান্য বন্ধুলোক না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ এবং যদি বা হইত, আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।' মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্তৃত ভাবে রাজা রামমোহনের সঙ্গে পারিবারিক যোগের চিত্র রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেবের সেই স্মৃতিকথাও শুনেছেন শৈশবকালের অবসরে। তাই রবীন্দ্র-মননে রামমোহন রায়ের এক রাজকীয় উন্নত ভাবমূর্তি শৈশবের জ্ঞানোন্মেষের কাল থেকেই ধীরে ধীরে অঙ্কিত হতে থাকে। একদা পারিবারিক পরিবেশে রোপিত অঙ্কুরই কালে মহীরুহ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে। রাজা রামমোহনের যথার্থ উপলব্ধি ও উপস্থাপনা রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেই মননশীল মানসে গ্রহণীয় রূপে ব্যাখ্যাত। রামমোহন ও তাঁর মতবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির ও ধর্মের বৈদিক ঋষির উপলব্ধির ও প্রজ্ঞার মৌলসূত্রের বিধৃত কোনো মূলহীন শাখাপল্লব মাত্র নয়। কোনো ভিন্ন পথের ও মতের উদগীতি নয়—এটি অবহেলিত প্রাচীন হিন্দু বৈদান্তিক কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত থেকে নবজাগৃতির বিশ্বধর্মের মৌলদর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় যাকে বললেন 'দিবে আর নিবে'। শুধু আপন সনাতন নয় তার সঙ্গে নবধারার সংযোগে পথ পরিক্রমা করেছেন তাই তিনি 'ভারতপথিক'।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩৪ সালে রচিত একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।

যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।'

জরা থেকে জাগৃতি, মূঢ়তা থেকে মুক্তির বোধ যেন জাতি পায় রামমোহনের ভাবচৈতন্যেও। রবীন্দ্র-মননে শতবর্ষোত্তীর্ণ ভারতে যা প্রয়োজন ছিল আজও অনেক ভাবে তারই প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। জাতীয় জাগরণে ভারত-ভাবনার সঙ্গে যিনি বিশ্বভাবনার উদগাতা তাঁর প্রভাব প্রতিনিয়তই প্রার্থিত।

'ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন।' (পৃঃ ৪৩৩ রচনাবলী ১১)। তিনি যে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদের চিন্তা দূর করে মিলনেরই মেলবন্ধনকারী—তাই বললেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ভাবজগতের আধুনিকায়নের পথের যথার্থ অগ্রপথিক রূপেই তিনি রাজার বিশিষ্ট ভূমিকার দিকদর্শন দান করেন। তাই ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ বলছেন—'রামমোহন রায়ের মুখ দিযে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে।' (পৃঃ ৪৩০ রচনাবলী ১১)। কারণ—'ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার 'সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদঘাটিত করে দিযেছিলেন।' রাজার রাজত্বে সেই সিংহদুয়ার উপনীত ভারত-সংস্কৃতি।

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার মধ্যেই 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রসঙ্গের আলোচনায় বললেন যে, য়ুরোপ বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মুক্তির আনন্দে উত্তরণের সন্ধান পাই নি যখন—'এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীনযুগে উদঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নতুন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের উত্তরাধিকার নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় রচিত হয়, যে নবযুগের সূচনা হয় তার অন্যতম পুরুষ ছিলেন রামমোহন। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন—'রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।' ইংরাজ রাজত্বের

সেইযুগে যখন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষের নবশিক্ষিত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন সেইসময়েই রামমোহন প্রবর্তিত মত ও পথ নবযুগের অভয়বাণী বহন করে আনলো নতুন দিগন্তের দ্বারোদ্‌ঘাটিত করে দিলো। দিশে-হারা সমাজ নতুন দিশারীর সন্ধান পেলো।

তৎকালীন সমাজ কিন্তু সামগ্রিক ভাবে রাজার নবীনমতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি, কিন্তু থমকে দাঁড়িয়েছিল বিচার-বিবেচনা করতে। রবীন্দ্র-মননে তাই উদ্ভাসিত—'সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্ম সাধনাকে পুঁথির অন্ধকার সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়।' তখনকার সমাজে একদিকে এমনি ভাবে রামমোহনকে ভুল বোঝার যেমন ছবি অন্যদিকে তেমনি তরুণ বঙ্গযুবকরা তাঁরই চিন্তায় জাগছেন।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে।' রবীন্দ্রনাথ এর সমাধান রামমোহনের ব্রহ্মসাধনার মধ্যে নিহীত আছে বলছেন। তিনি বিশ্বসত্তায় ব্যক্তিসত্তার জয়ঘোষণাকে ঘৃণিত জ্ঞান করছেন। বৃহতের সাধনায় বিশ্বভাবনা যেখানে সমষ্টির কল্যাণকামনায় নিয়োজিত সেইখানেই যথার্থ ব্রহ্মসাধনার প্রকাশ বলছেন। তিনি বললেন—'যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই অধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না।' রবীন্দ্রনাথ জানতেন রামমোহনের সাধনায় ছিল সেই সম্মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত। তাই বলছেন—'যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।' (পৃঃ ৪১২ রচনাবলী ১২) তাই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায় যে রাজা রামমোহ রায়ের মহৎদৃষ্টির প্রসারিত প্রাঙ্গণে, বৃহৎহৃদয়ের অবারিত অঙ্গনে—'আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি…।'

এ কথা বলার পরই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তখনকার সংকীর্ণমনাদের গোষ্ঠীগত মনভঙ্গি দেখে। বললেন—'কিন্তু, তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষারশুভ্র এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে।' রামমোহনের যে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা এবং

মহৎ ব্যক্তিত্ব, তার প্রবাহ যে কি উদ্বোধন প্রয়াসী তার সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশিত দেখি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্রে। তিনি বলছেন—'ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।'

রবীন্দ্র-মননে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যপূর্ণ ঐশ্বর্যে ভরা যে দীর্ঘপথের রেখা তারই পথের পথিক রামমোহন। কিন্তু তিনি সমকালের কুয়াশাচ্ছন্ন কুসংস্কার মানেন নি প্রচলিত আচার সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য স্বীকার করেন নি—ব্রহ্মের সত্যরূপ উপলব্ধির দীক্ষা দিতে চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—'ভারতপথিক রামমোহন'। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর অর্থপূর্ণ এই বিশ্লেষণ। ভারতের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সে আধ্যাত্মিক জগতের হোক, সে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের হোক বা রাজনৈতিক চিন্তার হোক—রামমোহন মৌলভাবে ভারতপথের পথিক, ভারতীয় ভাব ও ভাবনার, ভারতীয় জীবন ও মননের মধ্যেই বিশ্ববোধে কল্যাণবোধে সামগ্রিক চৈতন্যের ব্রহ্মাস্বাদে আনন্দিত চেতনায় উজ্জীবিত করতে চাইলেন। তিনি ভারতের সত্যসন্ধানী সাধনাকে যুক্তিনিষ্ঠ নৈষ্ঠিক বোধের আলোকে আলোকিত করলেন। তাঁর জীবনে বাণীর বারংবার ঘোষণা হয়েছে, তিনি সমস্ত জীবন-সাধনায়ও তাই প্রকাশ করেছেন।

রামমোহনের কর্মজীবনের বিচরণ ক্ষেত্রের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কথায় সুন্দরভাবে চিত্রিত। তিনি ১৪ই পৌষ ১৩৭০ সালে বলছেন—'ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়—বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।' (পৃঃ ৩৮৪ রচনাবলী ১১) রামমোহন এমনি এক অন্ধকার যুগের মধ্যে এলেন আলোর দীপশিখা নিয়ে, এলেন বদ্ধ ও আবদ্ধ প্রাঙ্গণে বেড়া-ভাঙার ডাক দিতে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন—'এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা।'

অনৈক্যকে ঐক্যবদ্ধ করা, বিভেদকে এক করা, অমিলকে মিলনের সূত্রে যুক্ত করা—এই যে মিলন-মন্ত্রের সাধনা বা একের সাধনা তাতো ভারতের প্রাচীনধারায় এবং ইতিহাসের শিক্ষায় আমরা জেনেছি। খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে অখণ্ডের

হদিশ মেলে না। অথচ এমন সময় এলো যে ভারতবর্ষের মানুষ আপন অখণ্ড বোধের মহতী ভাবনা থেকে বিচ্যুত হল স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন কুলপতিদের কৌশলে। একদিকে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে আচারবদ্ধ প্রচলিত রীতিসর্বস্ব হিন্দুয়ানী অন্যদিকে ঐতিহ্যের উদার ঔপনিষদিক মন্ত্র পুঁথিবদ্ধ। এমনি সময় রাজা রামমোহন রায় এলেন তাঁর উদার দৃষ্টি উন্নত মন এবং বলিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে ভারত-সংস্কৃতির আসল স্বরূপ উদ্ঘাটনে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন—'এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিনন্দন-গান সামাজিক জড়স্তূপের ঊর্ধ্ব আকাশে।' (পৃঃ ৩৮৬ রচনাবলী ১১)। ভারতের সাধক কবিজনের বাণীচয়নে দেখা যায় এক অমিত সাধনা দীর্ঘ দিনের ভারতীয় চেতনায় রসসঞ্চার করেছে। অতীতের কবীর, দাদু, রজ্জব এঁরাও ছিলেন ভারতপথিক। রবীন্দ্রনাথ এঁদের কথা উল্লেখ করছেন ভারতপথিক রামমোহন প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে—'এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।' যে অর্থে কবীর দাদু রজ্জব এঁরা ভারতপথিক সেই অর্থেই তো রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন রামমোহনও—কারণ 'তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে।' (পৃঃ ৩৮৬-৭ রচনাবলী ১১)। এই মিলতে পারার চিন্তাচৈতন্যেস্থিত মানসিকতা আধুনিক যুগের সর্বদেশের সর্বজাতির কিন্তু এর শুভসূচনা-কালে রামমোহন ছিলেন অগ্রণী চিন্তানায়ক। তাঁর চিন্তায় ও ও চেতনায়, তাঁর বাণী ও বন্দনায় ঐক্যের গভীর অনুভূতি ব্যঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথও সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি বলছেন—'আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থান-সংকীর্ণতা নেই।' (পৃঃ ৩৮৭ রচনাবলী ১১)। এখানে রামমোহনের ব্রহ্মবাদী সমাজমন্দির স্থাপনের কালে ঘোষিত একেশ্বরবাদের মানসিকতার মিলনতীর্থ রচনার বাণীবদ্ধ লিপিকার কথা স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণে আসে। সেখানে তিনি জাতিধর্মের কোনো

বিভেদের বেড়া রাখেন নি। সর্বধর্মের মানুষই মিলতে পারবেন সেখানে এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন তিনি তো ভারত-সাধনায় ব্রহ্মবাদী একেশ্বর চৈতন্যকে জাগ্রত করলেন। তিনি কোনো একদেশদর্শী মনকে স্বীকার করলেন না; সর্বব্যাপী উদার মননকে গ্রহণ করেছিলেন। আচার সর্বস্ব সংকীর্ণ গণ্ডির হিন্দুয়ানী নয় উদার ঔপনিষদিক ভারত-সংস্কৃতির ধারাকে তিনি অনুসরণ ও অগ্রগমনে সহায়তা করলেন। এখানে রবীন্দ্র-নাথের উচ্চারিত ভাষাতেই শুধু তো বলা যায়—'তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।' (পৃঃ ৩৮৭ রচনাবলী ১১)। রামমোহনের চিন্তায় মানুষের মহৎ মর্যাদাই।

কিন্তু সেদিনের ভারতীয় মানসে এমনি চিন্তা অভাবনীয়। সেদিনের ভারতে যে মানসিকতা বিরাজ করছে তা ইংরাজের চোখ ঝল্‌সানো ইংরাজিয়ানার প্রতি মোহ এবং দীর্ঘদিনের প্রথাসর্বস্ব আচারবদ্ধ সংস্কারজড়িত মানসিকতা। কোনো গভীর বোধ ও নিবিড় ভালোবাসা নিয়ে দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের সম্মান চিন্তারাজ্যে আসছিলো না। 'তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন।' (পৃঃ ৩৮৮ রচনাবলী ১১) রবীন্দ্রনাথ বললেন—'তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল।' একটি উদার মহতী, একটি বিভেদমুক্ত, একটি বলিষ্ঠ সজীব মানসিকতার অধিকারী হয়ে রামমোহন যে দেশ ও সমাজ, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিন্তা করতেন তা বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বোধিত। খণ্ডের চিন্তায় নয় অখণ্ড চৈতন্যের অভ্যুদয়ের বন্দনাগানে মুখর তিনি। তাই বলা হয়েছে—'মানুষের ঐক্যের বার্তা রাম-মোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন,এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়।' (পৃঃ ৩৮৮ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেই উদ্ধৃত করেছেন বহুপরিচিত ভারতবাণী—

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।'

[যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।]

১৩৪০ সালের ১৬ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের সন্ধিক্ষণে ভারতপথিকের আবির্ভাব যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তার উল্লেখ করেছেন। 'যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি

আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতোবাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্ত সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব।' রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে একটি প্রভাতী সূর্যের মতো উদার অন্ধকার ভেদ করে অভ্যুদয়িত বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ 'প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে।' (পৃঃ ৩৯০ রচনাবলী ১১)। রামমোহনের সংস্কার-মুক্ত-মানসিকতা কিন্তু সাধারণ জনের সংস্কারান্ধতার ফলে তারা স্বাধীনবুদ্ধিতে সবকিছু পরিচ্ছন্ন চৈতন্ত ও চেতনা, বোধ ও বোধিতে গ্রহণ করতে পারে নি। তারা অবিশ্বাসী নিজেদের বৃহৎ ও মহৎ অতীত বাণীর মর্মমূল সম্বন্ধেই। কিন্তু রামমোহন ভারতভূমির প্রাণের দিগন্তে চান বিশ্ব-মিলনের বৃহৎ সম্বোধি। আকাশের ঊর্ধ্বমুখী পাখি যেমন মাটির বাসা ভোলে না তেমনি রামমোহন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কারমুক্ত চৈতন্তকে জাগ্রত করতে চাইলেন কিন্তু ভারত-ভাবনার অনুষঙ্গেই। তাই তাঁর সর্বতোমুখী প্রগতিচিন্তার মৌল-কেন্দ্রে ভারত-সংস্কৃতির স্থায়ীভাব। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—'আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্তে, উজ্জ্বল করবার জন্তে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন···।' (পৃঃ ৩৯০ রচনাবলী ১১)। এ কথা বলার পরও একটি আক্ষেপের কথা উচ্চারিত হয় তা হল এই যে আমরা তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি নি, সরল মনে তাঁর উদার হৃদয়কে বুঝতে পারি নি বা বুঝতে চাই নি। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪০ সালেও প্রশ্ন করেছেন—'আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে?'

আজও আমরা সেই একই প্রশ্ন করতে পারি কারণ আজও তো আমরা রামমোহনকে বুঝতে পারি নি বা চাই নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উচ্চার্য— 'রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না।' কারণ— 'ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন।···দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। · রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ।' (পৃঃ ৩৯১ রচনাবলী ১১)। তিনি মানুষের হৃদয়ের মানুষ, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় মানুষ।

সেদিন যে মানুষটি বলিষ্ঠ মন নিয়ে যাকে অসার ও অসত্য বলে মনে করেছিলেন, কেউ কেউ তাকে কোনোক্রমেই স্বীকার করতে পারেন নি। মাতৃদেবীকেই তিনি মনে করেছেন দেবদেউলের প্রতিমার থেকেও বড় তাই মাতৃচরণেই আগে প্রণাম নিবেদন করতে আগ্রহী। মৃন্ময়ীর চেয়ে চিন্ময়ী মাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সতীদাহ প্রথা ওপরতলার চাপানো সংস্কারমাত্র তাই তাকে রোধ করতেই হবে, চারি পাশের সমাজ বিরূপতা পোষণ করুক তবু ন্যায় নীতি ও শুভবুদ্ধির জয় ঘোষণা করতে হবে। এই ভাবাদর্শের মানুষ, মনীষীপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন। তাঁর পত্রাবলীতে তাঁর কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের, স্বাধীনতাপ্রিয়তার ও মানবহিতৈষণার প্রতি গভীর প্রীতিপ্রসন্ন মানসিকতার পরিচিতি প্রকাশিত—যা কোনো খণ্ড কালের ক্ষুদ্র দেশের সীমার সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তা সর্বদেশের ও সর্বকালের, কারণ তাঁর চৈতন্যে সর্বদেশে মানব সমাজের কল্যাণবাণী। রবীন্দ্রনাথ বললেন—'রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।' (পৃঃ ৩৯১ রচনাবলী ১১)'। ভারততীর্থ পথের পথিক রাজা রামমোমন। তিনি ভারতীয় মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইলেন ভারতবাসীকে। তাঁর চৈতন্যভূমিতে ঐক্যের অভয়বাণী। ভারততীর্থে স্থিতধী যে—

> 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
> হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
> তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
> বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।'

কবির উদার আহ্বান—

> 'সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
> এই ভারতের মহামানবেব সাগরতীরে।'

রবীন্দ্রনাথ যে ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায তিনি নিজেই ভারতপথিক রামমোহন রায়ের স্মৃতিপূজার বেদীতে উপরের কয় ছত্র উচ্চারণ করে শেষ করছেন বক্তব্যটি এই কবিতার শেষের বহু পরিচিত উদাত্ত আহ্বানটি জানিয়ে—

> 'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
> মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয নি যে ভরা
> সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
> আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥'

রামমোহন রায় যে 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতেন তা রবীন্দ্র-মননে বারংবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্।' রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন 'ভারততীর্থ' রচনা বিষয়ে এই যে—'আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি (রামমোহন) বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে'। এবং তিনি সেই 'ভারততীর্থ' কবিতা উদ্ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি' বলেছিলেন ১৩৪০ সালের ১৬ই পৌষ।'

রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার দীপ্তি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি স্বদেশের মানুষের কাছে রাজা রামমোহনের মত ও পথের প্রতি আস্থার ভাব যে খুব ব্যপ্ত হয় নি তাও ব্যথিত করেছে। তাই নানা সময়ে সুবিধা মতো সে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘের উৎসবে ১৩৪৭ সালেও বলেছেন—'যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি।' তিনি তো ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র আর প্রচলিত বিশ্বের নানা দেশের মহৎ ধর্মের বাণী নিয়ে জীবন ও সমাজকে উন্নততর করতেই চেয়েছিলেন। তিনি তো দেশের ও দশের জন্যে ভ্রাতৃত্ব বোধকে জাগ্রত করতেই চেয়েছিলেন। তিনি তো উপনিষদের বাণী সর্বজীবের প্রতি সমধর্মী হবার শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন তবু আমরা সংস্কারের মোহ পাশে এমনি আবদ্ধ যে কোনো মুক্তির আলো দেখলে চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে বলে জানলা দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হই। উপনিষদের একটি মন্ত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথ তাই উল্লেখ করেছেন—'সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।' (পৃঃ ৩২৪ রচনাবলী ১১)। তাঁর অন্তর আত্মার পরিচয় চিত্রই রবীন্দ্র-দর্পণে রূপায়িত।

রবীন্দ্রনাথের একান্তের রামমোহন-চিন্তার জ্যোতির্ময় আলো বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে নানান মননশীলতার সূত্রে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে বললেন—'আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্য-সাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি।' (পৃঃ ৪৩৬ রচনাবলী ১১)। তিনি আরো সুস্পষ্ট বলছেন—'ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে।' তাঁর ১৩২৯

বঙ্গাব্দের ১৭ শ্রাবণের কথা অকস্মাই উচ্চার্য—'রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য।' (পৃঃ ৪৩৫ রচনাবলী ১১)। এমনি সুধন্য পুরুষ তিনি। আগেও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের উচ্চারণ রবীন্দ্র-রচনায়—'রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে ···।' এই যে পূর্ব-পশ্চিমের মেলবন্ধন এই তো রামমোহনের রাখিবন্ধনের অগ্রণী ভূমিকা। আর ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যের ধারাস্রোতের ভগীরথ রূপী রামমোহনকে চিহ্নিত করলেন রবীন্দ্রনাথই। তিনি বলছেন—'ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মার সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' আর ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের কথায় বলছেন—'রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিযাছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন।' (পৃঃ ৪৩৪ রচনাবলী ১১)। কারণ ভারত-জাগৃতির জ্যোতির্ময় পুরুষ তিনি।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে আধুনিক ভারতের চিন্তাচৈতন্যের ও নবজাগৃতির অগ্রদূত বলে বারবার ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতের অন্ধতমশার রাত্রির আঁধার কারাগার থেকে মুক্তির পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদে মহাভারতের অধিনায়ক আবির্ভূত হয়েছেন। প্রতিকূল সমাজের বুকে অনুকূল আবহাওয়া রচনা করতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপরিসীম অন্তর-সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। সমাজের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত সনাতন মত ও পথ নিয়ে, শাশ্বত জীবন ও ধর্মের আচার নিয়ে, শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ্য বিধিনিষেধ মেনে চলাকেই ধর্ম বলে জ্ঞান করেছেন। মানবধর্ম বা কল্যাণবোধ মনুষ্য শরীরে যদি না থাকে তাকে কেমন করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে চলবেন। তাতো পাবেন না তাই বিদ্রোহী আত্মা রামমোহনের বারবার সত্য ন্যায় ও কল্যাণের ধ্রুবসত্যে-স্থিত ধর্মকেই চেয়েছেন। তিনি কোনো আচার বা সংস্কার যা শাস্ত্রের নামে সমাজের সুবিধা ভোগীগণ চাপিয়েছেন তাঁদের সেই চাপিয়ে দেওয়া নকল অনুশাসন মেনে চলাকে গভীর পরিতাপের সঙ্গে দুর্বল চিত্তের কর্ম বলে বোধ করেছেন। পরিত্রাণের পথ তিনি একেশ্বর চিন্তায় দিয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন সমাজ জীবনে তা বহুলাংশের মধ্যেই অগৃহীতই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে যথার্থই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার অতীতে, সত্যের অকুন্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি।' রবীন্দ্রনাথ আর একটি অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা অতি সহজেই সেদিন বলেছিলেন যে—'এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক' এবং তার পরই বলছেন—'তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।' (পৃঃ ৩৭৫ রচনাবলী ১১)।

দেশ ও জাতির, সমাজ ও রাষ্ট্রের চরম দুর্দিনের সময় রামমোহন ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছিলেন। তিনি অন্ধকারের জীবনে যারা অজ্ঞান তাদের মধ্যে চোখের আলো নিয়ে এলেন—হঠাৎ চোখ তাদের ঝলসে গেল! ভাবলে একি উৎপাত, বেশতো ঘুমিয়ে থাকা গিয়েছিল—ঘুম ভাঙায় কে? নিশ্চয় সে দুষমন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভযে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনও শান্ত হয নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।' (পৃঃ ৩৯৪ রচনাবলী ১১)।

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে সুরক্ষিত। উত্তরের পর্বতমালা ও দক্ষিণের মহাসাগর বহিঃশত্রুর হাত থেকে এককালে রক্ষা করলেও অনেক জাতি ও আচার, অনেক ভাষা ও ধর্ম রযেছে যা খণ্ড খণ্ড সত্তায বিভক্ত করেছে ভারতবাসীকে। সব থেকে সমাজের ক্ষতি যা তা সম্পন্ন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন—'ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল'। যা ভারতীয মানসকে অনেক বড় কাজ থেকে দূরে রেখেছে এবং ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতির অন্তরায সৃষ্টি করেছে। এ কথা রামমোহন উপলব্ধি করলেন গভীর ভাবে। তিনি আত্মিক ঐক্যের সূত্র রচনা করতে চাইলেন। তিনি ধর্মের মৌলভাবনায আমাদের উৎসাহিত করলেন। তিনি একেশ্বরবাদী, পরমেশ্বর ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত এবং তিনিই আত্মাশক্তি যা আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রেরই মৌলবাণী। 'তযা হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।' এই মহৎ ঐক্যের আত্মার সৃজনকর্ম অনুপযুক্ত পরিবেশে জাগ্রত নেই দেখে আক্ষেপ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্য বিধির ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি।' (পৃঃ ৩৯৫ রচনাবলী ১১)।

রবীন্দ্রনাথ আবার এই বক্তব্যকেই আরো জোরদার করে বলছেন—'রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয়, বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।' (পৃঃ ৩৯৭ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালের ১০ই আশ্বিন আবারও বললেন—'নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্য শিক্ষার

অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল।' (পৃ ৩৯৬ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ বড় মন বা বিস্তৃত হৃদয়কে ঐক্যবোধের সর্বাপেক্ষা মহৎ অধিকার বিবেচনা করেছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বের যে মন থাকলে তবেই ঐক্যের লাবণ্যকে অনুধাবন করা যায় তা রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের চরিত্র আলোচনা করার সময় উল্লেখ করে বললেন— 'মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই রকম বড়ো হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।'

রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাজা রামমোহনের স্মরণসভায় আসেন এই মন নিয়েই কারণ তিনি তো বিশ্বাস করেন যে—'বর্তমান কালে অন্তত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেইসঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।' (পৃঃ ৩৯৬ রচনাবলী ১১)। রামমোহন যে সার্বজনীন সমন্বয়ধর্মী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী—এ তারই এক অকপট রবীন্দ্র-স্বীকৃতিই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবক্ষয়ের স্বরূপ-সন্ধান করেই সেদিনই বলতে পেরেছিলেন—'রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্য-সাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।' (পৃঃ ৩৯৭ রচনাবলী ১১)। রামমোহন প্রসঙ্গে পর্যালোচনায় এ যথার্থ রবীন্দ্র-উক্তি এবং উল্লেখযোগ্যই।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী থেকে জানা যায় রামমোহন ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। এবং মহর্ষিদেব ছিলেন রাজার অত্যন্ত স্নেহধন্য। এ কথার সমর্থন পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের কথাতেও। তিনি লিখছেন—'একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।' এবং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন—'পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।...আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদি পুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান

করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার বঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাঁহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে।' (পৃঃ ৪১৩ রচনাবলী ১১)।

এবং রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের ভাবমূর্তিটি তাঁর পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যসূত্রে অর্পিত হলেও তা যে কী গভীর ভাবে তাঁরও চিত্তপটে অঙ্কিত ছিল তা বেশ উপলব্ধি করা যায়, যখন পাঠ করি তিনি ইংরেজ কবির মতো বলছেন—'আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরি, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।" (পৃঃ ৪২২ রচনাবলী ১১)।

তাই রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১১ মাঘ বললেন—'রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মুক্ত করার কর্তব্য তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল সেই মহাপুরুষেরই কাজ।' এবং এই পরম রবীন্দ্র-উক্তির পর বলা যায়—আমরা জানি তিনি ছিলেন মানবাত্মার মুক্তমনের অগ্রনায়ক।

১৩১৪ সালের সম্ভবত পৌষ মাসের কোনো এক সময়ে রামমোহন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-মননে উচ্চারিত হয়—'রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' (পৃঃ ৪২৮ রচনাবলী ১১)। সেদিনের রামমোহনের বাংলা গদ্য রচনার প্রাথমিক অবদান প্রসঙ্গেই রবীন্দ্র-মননে যে একান্ত অনুভূতি জাগে তা অন্যত্রও প্রকাশিত, তিনি বলছেন—'অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙলা দেশের প্রভাত-বিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাঙলা ভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয়,

রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'
(পৃঃ ৪১৪ রচনাবলী ১১)।

রামমোহন বেশ কয়েকটি ভাষাচর্চা করেছিলেন এবং আপন মাতৃভাষা বাংলাগদ্যেরও প্রথম যুগের স্থপতি তিনিই। সব থেকে আশ্চর্য লাগে যে তিনিই ব্যাকরণ রচনাও করেছিলেন। রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের এই 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পাঠের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিফলিত ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের আলোচনায় লিখছেন—'রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন :

গৌড়ীয় ভাষায় অকারন্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোটখাট ; এতদ্‌ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন ঘট্ পট্ রাম্। রামদাস উত্তম্ সুন্দর ইত্যাদি।'

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের এই আলোচনা ঠিক গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বললেন যে, 'রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা, নরম গরম।' এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের এই পর্যায়ের রামমোহন উত্থাপিত যুক্তির শেষ সমাধান দিয়েছেন এই বলে যে, 'তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।' (পৃঃ ১৭ রচনাবলী ১৪)।

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এই গ্রন্থের 'অ প্রত্যয়' প্রসঙ্গের আলোচনায় বললেন—'এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই! মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা-ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রমাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে।' এই প্রসঙ্গে উদাহরণ সহযোগে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে 'ভাল' শব্দ ভাল্, হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা অকারান্ত উচ্চারণ করি।' (পৃঃ ৪০-৪১ রচনাবলী ১৪)।

রামমোহন রায় বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনচর্যায় ও মানসচর্চায় তার প্রতিফলন বিচিত্রধারায় সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথ অল্প কথায় রেখাচিত্র দিয়েছেন। তিনি রামমোহনের ভারতপথিক চেতনাকে অনেক বিষয়েরও প্রথম আলোক বর্তিকাই বলছেন। তাঁর কথাতেই বলা যায়—'শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এ দেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের

প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।' (পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭ রচনাবলী ১১)। এ এক সত্য উপলব্ধির কথা।

রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘের ১৩৪২ সালের ভাষণেও বললেন যে, 'আমাদের দেশে ধর্মের যখন এইরকম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিয়মের পথ পরিত্যাগ করে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন।' (পৃঃ ৩৯৯ রচনাবলী ১১)। অবশ্য তাই বলে যে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না তা নয় এবং তাঁর চিত্তভূমিতে উপনিষদ ঋষির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রামমোহন থেকে মহর্ষির মাঙ্গলিক মাধ্যমে তাই রবীন্দ্র-চেতনায় উদ্গীত ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ। 'আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁছেছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ বললেন—'অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনোদিন তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।' (পৃঃ ৩৯৯ রচনাবলী ১১)। রামমোহন চরিত্রের সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা রবীন্দ্র চেতনে ও মননে, ভাষণে ও লেখনে বারংবার অনুরণিত। তিনি রামামোহনকে এক আদর্শ চরিত্র সত্যসন্ধানী রূপেই চিন্তা করছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতপথিক রামমোহনকে কোনো ধর্মপ্রচারক বলছেন না। শুধু আবারো বলার তিনি যা লিখছেন —'ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে ; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে।' (পৃঃ ৩৯৯ রচনাবলী ১১)। এই মুক্তির আত্মার অবহেলিত অবস্থা থেকে স্বাধীন-চিন্তার ও যুক্তিনিষ্ঠার আকাশের নীলদিগন্তে উদার ঐশ্বর্যে বিচরণ। কোনো আচার সংস্কার বা অন্ধতমসার শাসনে নিগড়ে বন্দীদশা নয় মুক্ত বিহঙ্গের আকাশ উড্ডীন গতি। প্রাণের ঝরণাতলায় ছন্দের সহজ বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ আবারো ১৩৩৫ সালের ১১ই মাঘ বলছেন—'আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরও জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খৃস্টান-ধর্মও এই ধর্মভারবিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।' (পৃঃ ৪০৪ রচনাবলী ১১)।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের যে মহৎভাবনার শাশ্বত স্বীকৃতি দীর্ঘ পরিক্রমায় পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যে বিপুল ঐশ্বর্যের দর্শনভাবনা যুগে যুগে দেশে দেশে বৃহৎ সৃষ্টির রাজ্যে অনুপ্রেরণার স্থল হয়েছে তার মৌলকেন্দ্র সমদর্শিতা ও প্রীতিপ্রসন্ন বিশ্বমৈত্রী। মানুষের মধ্যে যে বিরোধ ও বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ ও বিক্ষোভ তার মধ্যে ঐক্যসূত্র রচনায়

মধ্যেই প্রতিভাত জীবনচর্যার মহত্তীজ্ঞান। তাই যেন ভারতীয় সাধন ঋষিরা বনভূমিতে উপলব্ধি করে মনভূমিতে স্থাপন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেই কথাই রামমোহনের ভারতপথিক সত্তার চিন্তায়—'এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধশান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এ দেশে বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনাস্তূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর করে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একদা সর্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না।' (পৃঃ ৪০৪ রচনাবলী ১১)।

রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের ভাবনায় অনেক সুন্দর ও মধুর অভিব্যক্তি অভিব্যঞ্জিত হয়েছে যা আমাদের শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা লাভের রসসৃষ্টি। তাঁর 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' পুস্তিকা সংকলিত হওয়ায় সেগুলি একত্র পাঠের সুযোগ বাঙালীর ঘরে সহজ লভ্য হয়েছে। সেখানে প্রতিটি আলোচনায় এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যে, সমস্ত রচনাগুলি মিলিয়ে এক অনুপম মানস-প্রতিমা সহজেই পাঠকের চিত্তে গড়ে ওঠে। সেই ভাবমূর্তিকে কত সুন্দরভাবে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। তিনি ১৩৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র বললেন—'চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই—কত কুৎসিত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে—দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে-রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য—তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই ধ্রুবসত্য। বিশ্ব-জগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে সৌন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্তনা কাজ করছে।' এর পরই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির মৌলবক্তব্য উচ্চারণ করলেন—'বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দস্বরূপকে অমৃতস্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।' (পৃঃ ৪০৬ রচনাবলী ১১)।

রবীন্দ্র-মানসে রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য রচনার প্রাক্ মুহূর্তে প্রকৃতি চৈতন্যের যে স্বরূপ-উপলব্ধি ও সৌন্দর্যজ্ঞান জাগ্রত হয়েছে তাতে ভারতপথিকের প্রতি যে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি তার প্রকাশ অতি সহজে আমাদের মনে ধরা দিয়েছে। তিনি

অষ্টাদশ সামাজিক পরিবেশে কিভাবে সুন্দর-বেশে রামমোহনের চিন্তাস্রোত অভিব্যক্ত হয়েছিল সে কথা বললেন—'মানবাত্মার মধ্যেও কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা থেকে সর্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে—এ-সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি।' রবীন্দ্রনাথ রামমোহন প্রমুখ মহাপুরুষের আবির্ভাবকে যুগ-জীবনে এক মহতী প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কবি চৈতন্যে কলুষমুক্তির দূতরূপে এঁদেরকে মহাশক্তির প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দেওয়ার কথাও অভ্যাসে ব্যক্ত করেছেন তিনি মহাপুরুষের চারিত্র-পূজাকে তাই জীবনধারার নবীন রসস্রোতের সঞ্জীবধারা রূপে দেখেছেন এবং বারবার দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন—'প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় করছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংকুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।' (পৃঃ ৪০৬ রচনাবলী ১১)।

রবীন্দ্র-মননকে রামমোহনের বহুমুখী কর্ম ও কীর্তি, বহুবিচিত্র ও অভিনব অভিজ্ঞান অভিব্যক্তি নবীন চৈতন্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্দীপ্ত ও রোমাঞ্চিত করেছে। উপলব্ধিতে এনেছে রামমোহনের সৃজনমনীষা অন্ধকারের গাঢ় তমিশাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকচৈতন্যে উদ্ভাসিত করার অভাবিত উদ্যোগকে। জীবনের সর্বজনমুখী জাগৃতির ও সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে জাগতিক মানসিকতার উত্তরাধিকার এনেছেন রামমোহন। বিভক্ত ব্যক্তিসত্তা একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার গভীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছে রামমোহনের চিন্তনে, মননে এবং প্রাণনে। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের জীবন ও বাণীর অনুধ্যান করে উপলব্ধি করেছেন—'এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্গময়'—অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মানুষ বলতে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব।' রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই অমৃতের আস্বাদ এনে দিয়েছেন কালরাত্রির অবসান করে কালাতীত যুগাতীত ও দেশাতীত এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহৎ বার্তাবাহক মহাপুরুষ যিনি বাংলায় সংস্কারবদ্ধ সংকীর্ণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি জীবনের আশৈশব সংগ্রামী কর্মপ্রচেষ্টায় জীবনের সার্থকতা নিরূপণ করে গিয়েছেন। যিনি শুধু সাধারণের প্রিয় হবার জন্যে নয় স্বসমাজের প্রতিনিধি হবার জন্যে নয় স্বদেশের কল্যাণব্রতী হবার এবং কল্যাণকর্ম করার চিন্তায় অধীর হয়েছিলেন। যিনি শুধু কর্মের পাহাড় রচনা করে নিজের প্রতিষ্ঠা আনেন

নি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কল্যাণমুখী উদ্যোগের দ্বারা। তিনি তাই জাতিকে দেশকে এবং ধর্মকে উত্তীর্ণ করে এক বিরাট বিপুল বিশ্বে অজানার ও অচেনার রাজ্যে খণ্ডিত প্রতিষ্ঠার ভূমি রচনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সেই যথোপযুক্ত উত্তরাধিকারী আমরা আজো হতে পারি নি, আজো আমরা রামমোহনের মত পরিচ্ছন্ন মানসিকতার কণামাত্র অধিকারী হতে পারি নি। আজো আমরা তাঁকে সর্বোতভাবে গ্রহণ করে বরণ করে নিই নি অথচ দুশো বছর প্রায় আগে জন্মেও তিনি সেদিনে যা উপলব্ধি ও উপস্থাপন করার সৎসাহস ও বলিষ্ঠতা দেখিয়েছেন আমরা তা পারি না। তিনি যে সত্যভূমির ওপর আপন যুক্তিনিষ্ঠ মনকে সুদৃঢ় করতে পেরেছেন তা আমাদের এই বিংশ শতকের আলোকিত চেতনাতেও সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ জাগে। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আগেও যে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন আজো তা যথার্থই সত্য। তিনি বলেছেন—'তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না—ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয় নি। নিন্দা অপমানের ভেতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত করতে হবে।' (পৃঃ ৪০৭ রচনাবলী ১১)।

অমৃতের আস্বাদন আসে মৃত্যু-উত্তীর্ণ হয়েই। রামমোহন-জীবন তারই প্রমাণপত্র। তিনি ছিলেন অমৃতের অধিকারী পুরুষ। রবীন্দ্র-রচনায় তাই বলা হয়—'রামমোহন রায় যে সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার উটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ বলে প্রতিমুহূর্তে তিরস্কার করেছে। হিমালয়ের উচ্চতা তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিমাপ।' (পৃঃ ৪০৮ রচনাবলী ১১)। বৃহতের নিকট সান্নিধ্যে যে উপলব্ধি তাই ঘটে রামমোহন রায়ের চিন্তায়। তিনি আত্মিক জগতের, মননশীলতার জগতের ও চিন্তার স্বাধীনতার জগতের এক অপার দিগন্তকে উদ্ঘাটিত করে ছিলেন। স্থবিরতা থেকে আন্তরধর্মকে সচল ও প্রবল করে তোলেন তিনিই। এবং তাঁরই মহত্বের দীক্ষায় ভারতীয় মহান ঐতিহ্যের উচ্চশিখর উন্নতরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

রামমোহনের জীবন ছিল প্রচলিত সমাজের মধ্যে বসবাস করার ফলে এক সংগ্রামী মহানায়কের মতো। সমস্ত জড়ত্বের পাষাণ প্রাচীর ভেঙে সমস্ত অন্ধ অমানিশা ভেদ করে তাঁকে প্রতিনিয়ত চলার পথ ও মতকে প্রতিষ্ঠিত এবং জয়যুক্ত করতে হয়েছে। সে শুধু সতীদাহ প্রথার রহিত করার মধ্যে নয়, শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনার মধ্যেই নয়—জীবন ও সমাজে স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে চলার জন্যে সংগ্রামের দ্বারা এর প্রমাণ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনী পাঠকের চোখে। রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবায়

সে কথাই বলছেন—'এমনতর বহু যুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে।' এমন উক্তির পরই রবীন্দ্রনাথ এক শাশ্বত সত্যবাণী শুনিয়েছেন—'তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তার মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে। এই পরুষ কণ্ঠের গর্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা যায় না যে, তিনি এ দেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্বল বচনের পুনরাবৃত্তি করে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতি-গর্বিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসংঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।' (পৃঃ ৪০৯ রচনাবলী ১১)। তাঁর যে চারিত্রিক ও মানসিক বিভূতি, তাঁর যে মনন ও চিন্তন শক্তি তাতে তাঁর যে কোনো কর্মেই প্রতিষ্ঠা ছিল সহজ লভ্য। কিন্তু তিনি জীবনে এই সহজ লাভের পথ পরিত্যাগ করে বিচরণ করেছিলেন সত্যের ও ন্যায়ের পথে, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে। তাই তিনি স্বাধীনচেতার মন নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করে ছিলেন এবং নিয়মিত রচনা লিখেছিলেন নির্ভীকতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন—'তিনি বহুযুগের পূজাবেদিতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করে নি।' আরো বললেন—'তিনি জানতেন সকল প্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা।' তাই জাগ্রত আত্মার জাগৃতি-পুরুষ রামমোহন। সমকালীন সমাজে তখন খৃষ্টানদের প্রবল প্রতাপ রাজশক্তির সূচনায়। কলকাতায় প্রথম বিশপ মিডলটন অনেক প্রলোভনের আশ্বাস দিয়ে রামমোহনকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলেন কিন্তু স্বাধীনচেতা রামমোহন তাতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন এবং জীবনে আর কোনোদিন এই বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন নি। এই ঘটনাটির উল্লেখ জর্মান ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলারও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই করেন এক আলোচনায়। অত্যন্ত আত্মাবমাননার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ যখন অসহায় ভাবে নগদ লাভের আশায় মগ্ন এবং ভারতের প্রাচীন গৌরবের অধিকারী হবার যোগ্যতাহীন হয়ে রয়েছে—এমনি সময় নির্মল হৃদয়ের অধিকারী যে পুরুষ এসেছিলেন তিনিই রামমোহন। রামমোহন ভারত সংস্কৃতিরই বাণীবাহক। এবং ঐতিহ্য সম্মত পথের পথিক। তিনি সাময়িক মোহান্ধতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বহুযুগের ওপারের সূর্যালোকের সোনার আলোয় ভরিয়ে দিলেন দেশ ও কালকে। আত্মার জয় ঘোষণাই ভারতবাণী। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন।' (পৃঃ ৪০৯ রচনাবলী ১১)।

রামমোহন যে কতখানি বিশ্ববোধে বিশ্বভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তা তাঁর বহু রচনায় ও পত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। বিদেশের এক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তাঁর ভোজসভার আয়োজন করার বিষয়টিতো সবারই সুবিদিত। ম্যাক্সমূলার তাঁর 'আই পয়েন্ট টু ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে সংকলিত ব্রিষ্টল মিউজিয়ামে ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের পঞ্চাশতম মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন—রামমোহনই প্রথম বিশ্বব্যাপী মিলনচক্রের রচনা করতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কোনো কোনো পত্রের মধ্যেও এর অভিব্যক্তি দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর এই চেতনার মৌলভূমির পরিচয় দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আবার অন্যভাবে বললেন—'যে-কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন সত্যরূপকে আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে, অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। ধর্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম-সংকীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।' (পৃঃ ৪০৯-৪১০ রচনাবলী ১১)।

যুগের চিন্তার অনেক আগেই স্বকাল এবং স্বসমাজ থেকে তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন। এবং আজও আমরা বিশ্ববোধের যে রূপ অন্তরে চিন্তাই করতে পারি না সে যুগে রামমোহন তা পেরেছিলেন। বিশ্বরাষ্ট্র নীতির বা দেশবিদেশের ধর্মনীতির তুলনামূলক আলোচনার অঙ্কুরই যখন রোপিত হয় নি সেই সময় রামমোহনের মনীষায় তা উদ্ভাসিত ও উদ্ভাবিত হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বের মানুষের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে চাইলেন। তিনি 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' বলেই জ্ঞান করতেন। অবিস্মরণীয় উক্তি রয়েছে এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের—'এই নূতন যুগধর্মের উদ্বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে।' (পৃঃ ৪১০ রচনাবলী ১১)।

ভারত-সংস্কৃতিধারার স্বকীয়তায় দৈন্যশূন্য ও দেওলিয়াশূন্য ভাবমার্গে তিনি এলেন উদার হৃদয়ের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে। কারণ—'মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ তাই আরো বললেন—'তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল' এবং ফলস্বরূপ যে মহান কর্মপ্রচেষ্টার ফসল বাংলা সাহিত্যে ঘটে তা

বলেই উল্লেখ করলেন—'যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিনত গন্তে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদকে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র ··।' এমনই ছিল শাস্ত্রজ্ঞ রামমোহন রায়ের জীবনধারায় সামাজিক পরিহাস।

রামমোহন যে নারীজাগরণের পুরোধাপুরুষ এবং রাষ্ট্রীয় সমাদরে উপেক্ষিত ছিলেন সে বিষয়ের অবতারণের উল্লেখে বললেন রবীন্দ্রনাথ—'সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা, যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সংকীর্ণ, যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি।' এই যুগজীবনের বুকে রামমোহন ছিলেন যুগন্ধর মহানায়ক, মননশীল প্রাজ্ঞজন। রবীন্দ্রনাথ তাই উচ্চারণ করেছেন—'মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।' (পৃঃ ৪১০ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ ৬ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রাজার এক শতবর্ষোত্তীর্ণ হওয়ার পরও যা বলেছিলেন তা আজও সমানভাবে স্মরণ ও মননেরই।

এবং রবীন্দ্র মননের উক্তি তাই—'রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্বান্তঃ-করণে স্বীকার করবার মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে।' এ কথা উচ্চারিত হবার পরও যা বললেন তাই তো উচ্চার্য—'আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি, তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্মাহত হই, কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নি, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফল তার বীজ বপন করবে।' (পৃঃ ৪১১ রচনাবলী ১১)। আর ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে তিনি বললেন,—'রাজা রামমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য নানা দিকে প্রকাশ পেয়েছিল।' তাই তাঁর কথা—'রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানই করা হবে।' কারণ তিনি বলতে চাইলেন—সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও

চেষ্টা করেছিল।' মানবিক সত্যের উদ্ঘাটনে সত্য-সাধক রামমোহন রবীন্দ্র-মননের প্রদীপ্ত-পুরুষ।

একমেবাদ্বিতীয়মের যোগযুক্ত মনা রামমোহন রবীন্দ্র-হৃদয়েও এক ও অনন্যরূপেই উজ্জ্বল। তিনি সেদিনই বলেছিলেন—'রাজা রামমোহন এই এককে, অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মতো বললেন ।' রবীন্দ্রনাথ এইখানে উদ্ধৃতি দিলেন—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' এবং এই উপলব্ধিকেই রামমোহনের বিশেষত্ব বলেই গ্রহণীয় রবীন্দ্র-চেতনায়। তাই বলছেন—'তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একক আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন, 'তাব সেই একে।'' রবীন্দ্রনাথ বললেন—'ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।' তাই রামমোহনকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেভূষিত করে দেখার কথাই রবীন্দ্রনাথের। আর বলেন সেইদিনই—'তিনি একক, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।' সত্যসন্ধানীপুরুষ রামমোহন ছিলেন। সে কথাই ঠিক অকপটে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'পৃথিবীর অন্য-সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই একক সত্যকেই চেয়েছিলেন।' আর সেদিনের উনিশ শতকের বুকে বসে রামমোহনের বোধের গভীরতার কথা ভেবে বলছেন—'এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন।' তাই রবীন্দ্রনাথ চাইলেন, রামমোহনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকেই বরণ করতে হবে। কারণ—'তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।' (পৃঃ ৪১৩ রচনাবলী ১১)।

সব থেকে বেশি চিরকালের মনে রাখার কথা ১৩০৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বন্ধলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিত বাহু বিশ্ববন্ধুর তাঁর সেই মানস বন্ধুসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার

জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।' বিশ্ববন্ধু রামমোহনের জ্যোতির্ময় আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোকের করুণাধারা প্রবাহিত হয়। এবং বলা যায়—'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়!' আর রামমোহনেরই হোক জয়।

সেই জয়ের ধ্বনিত কলরবের মধ্যে রবীন্দ্র-উচ্চারণও স্মরণীয়—'রামমোহন রায়েরও অন্যগতি ছিল না—সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন?' (পৃঃ ৪১৭ রচনাবলী ১১)। রামমোহনের আত্মার আলোকে আলোকিত চৈতন্যের অবগাহনেই উনিশ শতকের নবজাগরণে মৌল প্রাণতা। রামমোহনই নবজাগৃতির দীপ্ত অগ্রদূত! অগ্রণী অভিযানের অগ্রনায়ক!

এখানে উল্লেখযোগ্য আর একটি উক্তি ১৩০৩ সালের সম্ভবত আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের রয়েছে। সেখানে তিনি বলছেন—'রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল।' (পৃঃ ৪১৫ রচনাবলী ১১)।

রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের চিন্তা অপূর্ব ভাবে ও ভাষায় অভিব্যঞ্জিত। তিনি রামমোহনকে বলছেন ভারতপথিক। এবং একেশ্বরবাদী তিনি উদার ধার্মিক—বিশ্বধর্মের মৌলভূমির প্রতি তার আসল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—'নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তঃস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরাণের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা।' (পৃঃ ৪১৬ রচনাবলী ১১)। আবারও রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালের ৫ই মাঘ বলছেন—'রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কী সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।...কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন।' এ কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথের অনুভবে দেখা যাচ্ছে ধরা দিয়েছে রামমোহনের সত্য-সন্ধানী মানসের সেই আত্মার জয় ঘোষণারই মহৎ বাণী। তিনি ভারত ভূখণ্ডের জয়চিত্তের স্বাধীন চৈতন্যকে

জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। এবং এই জাগৃতির মহানায়ক হওয়ায় এলো তাঁর জীবনে প্রবল বাধা। আর তিনি প্রতিকূল স্রোত নিয়েই অনুকূল পথ রচনার আশায় মত পরিবর্তন করেন নি অকূল পাথারে সত্য ও বোধির কল্লোল সৃষ্টি করে চললেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন রামমোহনের সেদিনের মানসিকতা প্রসঙ্গে—'কিন্তু রামমোহন রায়ের কী অসামান্য ধৈর্যই ছিল! তিনি আর-সমস্ত ফেলিয়া পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি ফুৎকার দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশলাইকাটি জ্বালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নিপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।' (পৃঃ ৪২৪-৪২৫ রচনাবলী ১১)।

রামমোহন অবলুপ্ত চৈতন্যকে অবহেলিত আদর্শকে এবং অবদমিত চেতনাকে নবজাগৃতির উদ্দীপনা দান করলেন। তিনি প্রচলিত নিয়মের অনুশাসনের আরোপিত বোঝাকে নামিয়ে দিয়ে প্রাচীন গৌরবময় জীবন ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের এই কীর্তিভূমিকা আবিষ্কৃত হয়। তিনি বললেন—'হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জরত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতে-ছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন।' (পৃঃ ৪২৬ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথের এ কথাটি যে কত সত্য ও ইতিহাসনির্ভর তা তৎকালীন সমাজ বিবর্তনের তথ্য অনুধাবন করে পাঠকরা সম্যক উপলব্ধি করবেন। রবীন্দ্রনাথ সেই হেতুই লিখলেন—'তাঁহার এক দিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল,আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল—রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।' (পৃঃ ৪২৬ রচনাবলী ১১)।

রাজা রামমোহনকে মূলতঃ সমাজ সংস্কারক বলে এবং বিরাট মনীষীপুরুষ রূপে দেখার দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যথার্থ ভাবেই স্বসমাজের এবং স্বধর্মের যে একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন শুধু তাই নয় তন্ত্রের মতো হিন্দুধর্মের দুরূহসাধনার দীক্ষাও যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা মহর্ষির আত্মচরিতে রামমোহনের এক গুরুভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতকার বর্ণনায় প্রকাশিত। স্বধর্মের এক আদর্শরূপের সাধক প্রবক্তা ছিলেন বলেই অভিমত দিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-মননে প্রতিভাত—'রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে।···তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া

তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে লাগিলেন।' (পৃঃ ৪১৯ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে রামমোহনের যথার্থ চরিত্রের ও কর্মের বৈশিষ্ট্যটি ধরা দিয়েছে। তিনি পুরাতন সাম্রাজ্যেরই বিস্মৃতির অতল থেকে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করার কলাকার। কিন্তু আজও আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমরা পুরাতনকেই নূতন বলে দূরে দিতে চাইছি আর নূতন কালিমাকে পুরাতন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরছি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।' (পৃঃ ৪১৯ রচনাবলী ১১)। অত্যন্ত আন্তরিক ও অন্তর-স্পর্শী উক্তি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির পুনরাগমনের সূত্রে সমকালের আলোকে বলছেন—'যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া দিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার সমুন্নত ললাটে ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনও তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।' (পৃঃ ৪১৪ রচনাবলী ১১)। একেবারে ধ্যানে উদ্ভাসিত রবীন্দ্র-উপলব্ধির চিত্ররূপায়ণ। চিত্তচমৎকারী চিন্তার ধারা এ এক প্রবক্তার পরম প্রকাশে। কারণ তিনি বলেছেন—'মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায় নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন।' পুনরায় এ কথার উচ্চারণ করে চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর বিষয় স্মরণীয়—'রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসিগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!' (পৃঃ ৪১৬-৪১৭ রচনাবলী ১১) কারণ রামমোহন রায়ই আমাদের বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শকে সমাজ ও ধর্মে চিহ্নিত করলেন। এবং তিনিই—'ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূম্রজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' সেই ধোঁয়া থেকে মুক্ত ধৌত পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

> 'আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
> তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের সুরে ছন্দে ভাবে তাবায় এক মিলনের মাঙ্গলিক উৎসব

করেছেন দীর্ঘ জীবনের মহৎ কবির্মনীষায়। রামমোহন রায় 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি যে-সব সংগীতরচনা করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্র-মননে এনেছে বিচিত্র ভাবনার ও সুরের অনুরণন। ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন অনেক আর রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদাংগ সুরারোপও রামমোহনের সংগীতগুলির ব্রাহ্মসমাজে আশৈশব শ্রবণেরই পরোক্ষ প্রভাবেও তো কিছুটা। তাঁর সুবর্ণিত গল্প-উপন্যাস কাহিনীর বহু বিভিন্ন অঙ্কিত চরিত্রে বা প্রবন্ধাবলীতে রবীন্দ্র-মননের ক্রিয়াশীল রামমোহনের মতের ও পথের অনুবর্তন ক্ষণদীপ্তির মতো হঠাৎ উদ্ভাবিত হতেই পারে। তাই বলা যায় অকপটে অবশ্যই ভূমি থেকে ভূমার দীক্ষা রামমোহন-বোধেরই গভীর অভিজ্ঞান রবীন্দ্র-মননে—যা তাঁর অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার উনবিংশ শতকের বুকে।

'ভারতপথিক রামমোহন' প্রসঙ্গের প্রারম্ভ ভাবনায় সেই ১৩৪৭ সালের রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাই লেখেন—

> 'নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
> যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
> ...
> তাদের সন্মানে মান নিয়ো
> বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।'

গীতিকবিতার আলোকে রামমোহন

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'—কেন জানি না এটাই যেন বলতে ইচ্ছে করে যখনই রাজা রামমোহন রায়ের 'সঙ্গীতাবলী'র কথা মনে আসে। কারণ ধর্ম ও কর্ম, সাধনা ও সিদ্ধির এই পথ পরিক্রমায় একান্তই যুক্তিনিষ্ঠ-পুরুষ রামমোহন রায় চিন্তার সৃজনী-শক্তির অক্ষয়সৌধে উপনীত হন গীতিকবিতার চরণে চরণে—যেখানে মানস-বিহঙ্গ উর্ধ্বগামী ভাব ও ভাবনায়, সাধন ও সাধনায়। গভীর বক্তব্য অতি সরলভাষায় শব্দমালিকায় প্রকাশিত অথচ সূক্ষ্ম জ্ঞানমার্গের মৌল রহস্য অন্তর্নিহিত। শব্দের সীমা অতিক্রম করে যা ভাবরাজ্যের উধাও আকাশে মনকে উর্ধ্বে উন্নীত করে, বিবেক-বৈরাগ্যে ত্রিগুণাতীত চৈতন্যে আত্ম সমাহিত হতে দীক্ষা দেয়। এই সসীম সংসার থেকে এক অসীম ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণশীল চেতন সত্তায় যোগ-যুক্তি ঘটায়—ব্রহ্মের অদ্বৈতবিভূতিকে উপলব্ধির আঙিনায় প্রতিষ্ঠা যোগায়। যে

বোধ ও বোধি উপনিষদের ঋষির, যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেদান্তের সূত্রে-ভাষ্যে—তারই নবরূপায়ণ নবীন ভাষায় রামমোহণ তাঁর গীতিকবিতায় প্রকাশ করেছেন।

একটি আত্মগত উপলব্ধির ভাব-অভিব্যক্তির উৎসার নিয়েই গীতিকবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ। তাই চর্যাপদ, বৌদ্ধগান ও দোহাবলী বা দোহাকোষ রচিত হয়েছিল একটি সাধকের বা সাধক মার্গের মত ও সাধন সিদ্ধির আত্মগত উপলব্ধির আলোকে; সেগুলি ছিল তাঁদের সিদ্ধাই পথের পাথেয়। পরের যুগে শৈব, নাথপন্থী, আউল বাউল বা যোগীরাও এই সাধনসংগীত রচনায় সাধনার গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের কীর্তন বা মীরাবাঈ প্রমুখের ভজনও এখানে উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমভাব বা শাক্তপদাবলীর মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসময় গীতিকাগুলি ভাবসাধকদের বিশেষ উন্নতমানের মানসিকতার পরিচায়ক হয়ে আছে। ভক্তিগীতিকার রচয়িতাবৃন্দ যেমন সাধক ছিলেন উচ্চমার্গের তেমনি তাঁদের গীতিধারাও উন্নতমানের। এবং তাঁদের গীতিকায় অভিব্যঞ্জিত ভাব ও ভাবনা ভারত-সাধনার মৌল নির্যাস। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত রামমোহনের 'প্রার্থনাপত্র' পুস্তিকায় তিনি বলেছেন—'দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরুনানকের সম্প্রদায়, ও দাদূপন্থী, ও কবীর পন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।' রামমোহন পূর্বসূরী সাধকদের সেই গীতিধারায় অবগাহন করেই বললেন—'ভাষা বাক্যই কেবল তাহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে সমর্থকদের প্রতি কহিয়াছেন যে—

> ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।
> গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥
> বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
> তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥'

এখানে এর অর্থ দাঁড়ায় এই—'ঋক সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান, ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান, ব্রহ্ম বিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়, মোক্ষ সাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীনাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রধান এবং তালজ্ঞ ইহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হন।'

সংগীতের সুরলাবণ্যে মনের আকাশ বৃষ্টিস্নাত হয় এবং সেই বর্ষণবিধৌত নির্মল আকাশে রামধনুর বর্ণালী খেলে যায় ভাববিভূতিতে। গীতিকবিতায় এই ভাবসংগীত বা সুরে সুরে এবং জীবনচর্যার ভাবে ভাষায় ভরা তারও প্রভাব মানসলোকে এমনিই এক সুরের ধারায় হৃদয় সুস্নাত হবার পর ভাষার ভাবরাজ্যে রামধনুর সাত রঙকেই বিচ্ছুরিত করে।

'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে রামগতি ন্যায়রত্ন রাজা রামমোহন রায়ের গীতিকবিতা রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, বোধ হয়, পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্ব্বক উহা গাহিয়া থাকেন।' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের এই গীতিকবিতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেই রয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনাকালে ,ইংরাজি কমা ও সেমিকোলান ব্যবহার যেমন বাংলা গদ্যে প্রথম করেন তেমনি গীতিকবিতায় কমা ও সেমিকোলান ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। শশিভূষণ বসু 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখছেন—'এ জন্য রামমোহন রায়কে বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।' রাজার গীতিকবিতার বিষয়েও তিনি আরো লিখেছেন—'রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সংগীত রচনাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতির রচিত ধর্ম্ম-বিষয়ক সংগীতগুলি শত শত লোকের প্রাণে শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করিত, এখন যে সে সকল সংগীতের চিত্তমুগ্ধকারিণী প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, তবে, ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ক জাতীয় সংগীত সকল নূতন নূতন ভাবে ও ছন্দোবন্ধে রচিত হইয়া দেশে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিতেছে। রাজা রামমোহন রায় যখন, সমাজের বিবিধ হিতসাধনে রত ছিলেন, তখন তিনিও মানব-হৃদয়ের এই শান্তিপ্রদায়িনী সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'

রামমোহনের পূর্বে সাধনমার্গে সংগীত একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। বৈষ্ণব বা শাক্ত, বাউল বা নাথযোগী, খৃস্টান পাদরী বা মুসলমান ফকির সবার কণ্ঠেই নিজের ভাবের বাহন হয়ে গীতিকার প্রচলন আছে। চার্চের প্রার্থনায় সংগীত একটি বিশেষ অঙ্গ। ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন বাংলা কীর্তন বা শ্যামাসংগীতের মতো ভক্তি তথা ভাবসংগীত বিশেষভাবে অঙ্গীভূত করান। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন—'রাজার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞানসাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনানুযায়ী রচিত। ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণ্যা-তীতভাব, সর্ব্বব্যাপীত্ব ; দ্বৈতভাববর্জ্জন ও অদ্বৈতভাব দূরীকরণ, সংসারের অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

রামমোহনের জীবনসাধনার মৌলভূমিতে যে ভাববিভূতি স্থায়ী বসতি স্থাপন করে তারই রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে গীতিকায় স্বল্প শব্দের ছন্দিত প্রকাশে। সেগুলি

সেই হিসাবে রামমোহন-ভাবনায় নিটোল মুক্তোর দানা বিশেষ। গভীর তত্ত্ব নিবিড় ভাবনায় ব্যক্তিত্ব।

রামমোহনের মানসপ্রকৃতি সংগীত উপলব্ধির পূর্বে যথার্থ স্থির ধারণায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজার ব্যক্তিজীবন সত্যবোধের আলোকে উজ্জ্বল। তিনি পিতামাতা পরিজন সকলের প্রতি এক সত্যের ধ্রুব-নীতির নিরিখে সর্বচিন্তা প্রবাহিত রাখেন। রামমোহন রাধানগরের বসতি ত্যাগ করে রঘুনাথপুরে বাড়ি-ঘর করে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি একেশ্বরবাদী আরাধনার মঞ্চ স্থাপন করান। রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী ঐ মঞ্চটি দেখে স্বাভাবিকভাবেই একদিন প্রশ্ন করেন 'কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ?' রামমোহন তখন উত্তর করেন—'গাভী সকল নানা বর্ণের, কিন্তু দুগ্ধ সকলের একবর্ণ—নানা মুনির নানা মত, অতএব সত্যপথ আশ্রয় করাই সকল ধর্মের সার ধর্ম।' এখানে স্বভাবতই পরবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ কথায় ধর্মকথা বলার সঙ্গে এই মতের সাধর্ম্য অনুভব করা যায়। রাজা রামমোহন তাঁর ব্রহ্মসংগীতগুলিতেও সার্থক জীবনযাত্রায় সাফল্য সন্ধানে এই 'সত্য পথ আশ্রয়' করার বাণী উদ্গীত করেছেন। এবং যা সর্বকালের ও সর্বদেশের মনীষীরই মানসিকতা।

'অসাধারণ তর্কশক্তিসম্পন্ন হইয়াও তিনি যে কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।' জীবনীকারের এই উক্তির যথার্থতা তাঁর গীতিকবিতা-গুলিই। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরেও সংগীতগুলি বহুল প্রচারিত ছিল। 'সঙ্গীতাবলী' আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় মাঘ ১৮১০ শকে। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ২ আশ্বিন ১৭৭৫ শকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মগীত'। এতে বলা হয়—'একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মবিষয়ক গীতসমূহ যাহা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন সঙ্গীত হয়।' এটিতে ৭২টি গীতিকবিতা সংকলিত। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রামমোহনের এবং তাঁর অনুবর্তীদের রচিত কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক আরাধনায় গীতিসংকলন রূপে প্রচারিত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সঙ্গীতকোষ', 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'শতগান,' 'বিবিধ ধর্মসঙ্গীত,' 'গীতরত্নমালা' সংকলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মসংগীত অংশ এবং 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যাতে রামমোহনের গীতি-কবিতাগুলি অনেকটা অংশই নিয়ে রয়েছে। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' সংকলনের প্রথম ভাগে 'প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়' দিতে গিয়ে বলা হয়েছে তাঁর জন্ম সাল ১৭৭৪ এবং বলা হল—'ইহার রচিত বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই রাজার গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হন। রামমোহন রায়ের ধর্মমতের বিরোধী ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাজার গান শ্রবণে কত লোকের যে আধ্যাত্মিক উপকার হইয়াছে তাহা সংখ্যা করা যায় না।' ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে এই অভিমত কিছু উচ্ছ্বাসভরা হলেও রাজা রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে যে গীতিময় একটি

ভাবচৈতন্ত ঊর্ধ্ববিহারী ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর জীবনীকাররাও তাই তাঁর গীতিকবিতার বিষয় স্বল্প হলেও উল্লেখ না করে পারেন নি। এই সংগীতিকার সুর ও বাণী যেমন উচ্চাংগের তেমনি সুরুচির ও সংযত গায়কীর যুগসম্মিলনের প্রকাশ। এগুলির মধ্যে ভাবমার্গের উন্নতমানের ভাষা এবং রাগতালের চিরায়ত প্রয়োগ পদ্ধতিও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ যেথায় নিযুক্ত করেছেন সেথায় বিচরণশীল মানুষ বোধের সান্ত্বনা থেকে বলেন—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' 'চিত্রা'র কবি রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা'র ওপর এমন আস্থা রেখেই ছিলেন। কবির গভীর চিত্তভূমিতে আত্মনিবেদন অথচ রাজার মানসলোকে প্রশ্নমনোস্কতা প্রবল। তাই কিন্তু রামমোহন বলে উঠলেন—

'কে ভুলালো হায় কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়।
আপনি নাড়হ যাকে, / যে তোমার বলে তাঁকে / কেমন ঈশ্বর তাকে কর অভিপ্রায়?
কখন ভূষণ দেও, কখনো আহার ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সম্মুখে নাচাও তারে—/হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?'

'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তিকায় এর প্রথম কয়েক পংক্তির পাঠভেদ দেখা যায়—সেখানে নিম্নরূপ লেখা আছে—'মন তোরে কে ভুলালে হায়।' প্রথম ছত্ররূপে। দ্বিতীয় ছত্র ঠিক আছে। তার পর নিম্নরূপ—

'প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে, জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।'

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা'র এই ব্রহ্মসংগীতটি গীত হয় বলে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ১৬ খণ্ডে ৫৪ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর উদ্ধৃত গানের মধ্যে পাঠভেদ দেখা যায় এক জায়গায়, যথা—'আপনি গড়হ যাকে। যে তোমার বশে তাঁকে'। এমনি অনেক গানেরই কথায় পাঠভেদ পাওয়া যেতে পারে তবে আমূল তফাৎ না হলেই হল। সে সময় যদি সতর্কতা অবলম্বন করে মুদ্রিত হত তবে এ ধরনের তফাৎ না থাকার কথাই ভাবা সম্ভব ছিল।

কথায় বলে 'যত ছিল নাড়াবুনে হল সব কেত্তুনে।' এক সময় যারা একেবারে বাউণ্ডুলে ছিল তারা বেশ আখড়া আশ্রয় করে কর্তৃত্বের আওতায় এসে গিয়ে নানা বুলি কপ্চাতো। তেমনি একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যখন বঙ্গসমাজের ক্ষয়িষ্ণু জীবনস্রোত প্রবাহিত ছিল সেই সময় রামমোহন এলেন। দেখলেন বহু ঈশ্বর বহু গুরু বহু মত এবং বহু ঘৃণ্য আচার ও কুসংস্কার। অদ্বৈতের আসন অদৃশ্য প্রায়। শুধু পুতুল খেলায় ভুলে থাকে সমাজমানস।

অনেক পরে হলেও স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপ ছন্দিত প্রকাশ দেখি—'বহুরূপে সম্মুখে তুমি ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'? যদিও তার পরেই তিনি অসংকোচে যা বললেন তা অন্য কোনো ধর্মপ্রচারকের কণ্ঠে শোনা যায় নি। স্বামীজী বললেন—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' বহু প্রচারিত এ বাণী—

বহুভাবেই গুঞ্জরিত। যা চৈতন্যের বাংলায়, রামমোহন ও রামকৃষ্ণের বাংলায় যথার্থ উত্তরাধিকার।

ভ্রান্তির ছলনায় মরীচিকা অন্বেষণ। তাই সাংসারিক মায়ার বিভ্রান্তির মধ্যে মগ্ন মানসিকতা। রামমোহন এমনি একটি ভ্রান্তির গীতিকবিতা রচনা করলেন—

'একি ভুল মন। দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বের ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে, আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন
চন্দ্র সূর্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত তারে দোলাইতে কত, করহ যতন।
পশুপক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে, চাই সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন।'

এদিকে রবীন্দ্রনাথ বললেন— 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
···বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।' এ ভাবেই বলে উঠলেন।

মানব সংসার আর বিশ্বপ্রকৃতির একাত্মতায় রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ অভিযাত্রী। রামমোহন তাঁর আত্মীয় সভায় সংগীতে যে ভাব প্রচার করলেন তা আত্মগত হয়েও বিশ্বগত হয়েছে কারণ এর মধ্যেই যে শাশ্বতসত্যের মৌল ভাবনা অভিব্যঞ্জিত রয়েছে। যেখানে একের নয় বহুর কথা বলা হয়ে চিরন্তন বক্তব্য উপস্থাপন করছে সেখানে তাকে বৃহৎ মর্যাদা মহৎ ভাবনার কোটাটুকু দিতে অস্বীকার করা চলে কি?

'মন একি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইচ্ছাগচ্ছ বল তাকে, তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ তিষ্ঠ বল তারে, একি অবিচার।
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার।'

সংসার জীব সংসারকেই ভুলের বালুবেলায় বিচরণ করা যদি ভাবে তা হলে সব কিছুই মায়াময় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রামমোহন এমনি ভাব নিয়ে রচনা করেছেন কয়েক ছত্র—

'একি ভুলে রয়েছ মন বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ।
পঞ্চভূত জড়ময়, কভু আছে কভু নয়, সকলি অনিত্য হয় দারা সুত ধন জন।
ভুলনা মায়ায় আর ত্যজ আশা অহঙ্কার, ভজ নিত্য নির্বিকার পুনর্জনন-হরণ।'

'মোহমুদগর' যেন রামমোহনের বাণীতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি প্রাচীন বাণীর নতুন রসমূর্তি উপস্থাপিত করলেন। তাঁর একটি গানে তো তিনি এক সময় 'মোহমুদগর'কে সংগীতকলির পরেই পরিপূর্ণভাবে সংযোজিত করে দিয়েছিলেন। সে গানটি এই—

'সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
হে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব শাস্ত্রে গায়।'

এর পরই যে ষোড়শ ছত্র উদ্ধৃত তা কি 'মোহমুদ্গর' নয়? সে ছত্রগুলি এই—'মা কুরু ধনজন যৌবনগর্বং।/ হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং।/ মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা/ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।/ নলিনী দলগত জলমতিতরলং।/ তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।/ ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।/ দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ।/ শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।/ কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ।/ বালস্তাব্যৎ ক্রীড়াসক্ত,/ তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ।/ বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।/ পরমে ব্রহ্মাণি কোপি ন লগ্নঃ।'

এরই আর একটি পাঠ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে এই শেষের 'মোহমুদ্গর' অংশ নেই। ধ্রুবপদের প্রথম ছত্র ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছত্রে বলা হল 'যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকার।' এখানে রামমোহন 'বদন' শব্দের মধ্যে ধ্বনি সাদৃশ্যে 'অদন' ব্যবহার করে ধ্বনিতত্ত্বের বোধের পরিচয় রেখেছেন কিন্তু আজকের দিনে অচলিত শব্দ। আহার গ্রহণ নাসিকায় করায় ভ্রান্তি বুঝিয়েছেন ভাবোভাবেই। এর পর ছত্রগুলি নতুনই প্রায়—'সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা-শূন্য।

ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, করো জ্ঞ অনুরোধ
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়।'

বিতান অংশ থেকে অন্তরায় এসে গভীর থেকে গভীর জ্ঞানমার্গের মধ্যে নিমগ্ন হলেন। ধ্রুবপদে ছিল তথ্য, অন্তরায় এসে হয়েছে তত্ত্ব। ধ্যান থেকে হয়েছে জ্ঞান। এবং সব থেকে নাটকীয় ভাবনার পরিবেশনা বলা যায় শেষ ছত্রে, যেখানে বলছেন—'মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়।' মোহ ভঙ্গেই মুক্তি।

রামমোহন-মানসিকতার উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে তাঁর ভ্রান্তি প্রদর্শন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এবং প্রবণতা এক কথায় বলা যায় 'মোহমুদ্গর' প্রভাবিত। এমনি আর একটি উদাহরণ স্থাপন করা চলে যেখানে বলছেন—

'এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে। যার অন্বেষণ কর সে নির্বাসে সর্ব্বান্তরে।
সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজ রূপ করে স্থিতি, শশিতে শীতলতা জগতে এই রীতি,
তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যপ্ত চরাচরে।'

এখানে উপনিষদের বা বৈদিক ঋষির ধ্যান হয়তো অনুপ্রবিষ্ট দেখবেন—যেখানে সবকিছুতে ব্রহ্মের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে বা আত্মা ও পরমাত্মার অদৃশ্য যোগযুক্তির ভাবনা প্রভাবিত করেছে। কিন্তু রামমোহনের 'মোহমুদ্গর' প্রসারিত আর একটি বাণীবন্ধন উল্লেখযোগ্য। যেখানে বলছেন—

'ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ
দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্বরাশরজ্জু মন।
বিষয়ে বিরত হয়ে মোক্ষপথ আশ্রিয়ে, মায়া জিনি ব্রহ্মভাবে কর অবস্থান।'

গীতার মায়া-জয়ী নিষ্কামকর্মের অনুধ্যান কি এখানে রামমোহন চেতনাকে আলোড়িত করেছে? ভ্রান্তজীবের অজানা শিব।

রামমোহন গীতিকবিতায় বাণীতে, মোহভঙ্গ করানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি উপদেশছলে গীতবাণী প্রচার করছেন। শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে যেমন অর্জুনকে মোহভঙ্গ করিয়েছিলেন। বলেছেন—'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতেপরাম্।' ৫৪/১৮ অর্থাৎ 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা সেই মহাত্মার। শোক নাই আকাঙ্ক্ষাও নাহি কিছু তাঁর। সর্বজীবে সমভাবে সমদৃষ্টি যাঁর। পরাভক্তি মোর প্রতি লভ্য হয় তাঁর।' [সনৎকুমার মজুমদার অনূদিত] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থে 'রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্গীতা' অংশে বলছেন রাজা নাকি বন্ধুবান্ধবদের নিকট বলতেন—'গীতার কথা শুনে না যে, তার কথা শুনবে কে?' রামমোহন গীতার নিষ্কাম ধর্মের জয় ঘোষণা করতেন। জানা যায় রামমোহন ভগবদ্গীতারও বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন। আচার্য সুকুমার সেন এ কথা 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে বলেছেন।

রামমোহন বলেছেন—

'ভুলো না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ওযে কর্ম্ম তরু ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন, নিত্য সুখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয় অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ।'

এখানে পরবর্তী কালের মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন সঙ্গীত' মনে আসে। সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করছে সবাই, আপনপর কোথায়? 'তুমি কার কে তোমার।' অথবা 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।' এমনি প্রাচীনের ধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হয়।

'অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান। পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি সুসার
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান।'

রামমোহন রায়ের একটি ছিল সংস্কারকের ভূমিকা তা শুধু আচার পদ্ধতি ও সমাজ রীতির মধ্যেই সীমিত নয়। তিনি দেশ-মানসিকতারও নির্মল নিষ্কলুষ মুক্তিবিহঙ্গের আনন্দময় চৈতন্যকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বভাবসুন্দর ও সহজ বলিষ্ঠ ভাবনায় উদ্দীপন চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন এমন মানসিকতা যা সত্য শিব সুন্দর বোধেই উজ্জীবিত থাকবে। 'জল ভ্রমে মরীচিকা আশামাত্র সার' হবে না। 'অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান' এমন কথাই বলতে তাই হয়েছে রামমোহনকে। তিনি অজ্ঞান অনুষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞানহারা জীবশক্তিকে চান নি। পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণের মতো বা বিবেকানন্দের মতোই তিনি জীব থেকে শিব জ্ঞান জাগাতে চাইলেন। তাই বলেছিলেন 'ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব না জানিলে নিজ শিব' ইত্যাদি। তাই এখানে যদি রামমোহনের পূর্বসূরী চিন্তার কথা বলা যায় তা হলে হয় তো খুব ভুল হবে না। তিনি ভুলের বালুচরে জীবজীবনে শিবজীবনেই উত্তরণ চাইলেন যদিও তিনি ব্রহ্ম এক ও

অদ্বিতীয় বলছেন। এখানে শিব অর্থে বোধ হয় শাশ্বত মঙ্গল-বিভূতিই বলতে চেয়েছেন। যা মঙ্গলের যা কল্যাণের বা শাশ্বতীর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এই তিন পুরুষ দেবতার বোধিতে ভারতীয় সাধনমার্গের মৌল অগ্রগতি। বিষ্ণু সাধকরা বৈষ্ণব, মহেশ্বর বা শিব সাধকরা শৈব। এবং রামমোহন তাঁর প্রজ্ঞালোকে এক ব্রহ্মবাদী মানসিকতায় স্থিতধি ছিলেন। পরম ব্রহ্মের মতাবলম্বী হয়েছিলেন রামমোহন অনুসরণীয়রা। অবশ্য প্রকাশ্যে এইটুকু বলা হয়েছে যে একটি স্বতন্ত্র সমাজ বাংলাদেশ তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কিন্তু আসলে তাঁর জীবনকালেই এমন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার রশ্মিজাল তিনি ব্রহ্মসমাজে বিচ্ছুরিত করেছিলেন যার ফলে সমগ্র সমাজমানসই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। শুধু গীতিকবিতার আলোকে যে প্রভাব তাই পরে আলোচনাকালে সমর্থিত হবে।

'পরমাত্মায় মনরে হও রত। বেদ বেদান্ত সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।
বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝ না রে, স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত।'

অথবা দেখছি রামমোহন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এমনি ভাবেরই বাণী—

'স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। আর কি চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।
সাঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তাঁরি মানি
ত্যজ আশা অহংকার।'

একেশ্বরবাদী রামমোহন সর্বভূতে এক পরমশক্তিধর ব্রহ্মের অবস্থিতি ও আধিপত্য স্বীকার করেছেন। তিনি পরমেশ্বর স্মরণের মানসিকতাকে বারবার বিচিত্ররূপে বিভিন্নভাবে ও বিবিধ ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় গীতিকবিতাটি এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, সেটি এই—

'ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং। তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং।'

এখানে উল্লেখযোগ্য 'মহেশ্বরং' শব্দযুক্ত শ্লোক গ্রহণ করেছেন যা তাঁর অনুরাগী মহলে গীত হয়ে থাকে। হয় তো এই 'মহেশ্বরং' শব্দের অর্থগত প্রয়োগই ধরার, ব্যঞ্জিত পৌরাণিক দেবমূর্তি নয় বলেই বলা হবে। সেসব যাই হোক রামমোহন যে একেশ্বরবাদী মানসলোকের বিচরণভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন তারই একটি প্রকাশ রূপে বা প্রচার মাধ্যমরূপে গীতিকবিতার বাণীবন্ধনে তাই বন্দিত।

চোখ বাঁধা কলুর বলদ বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন সেই সংসার বদ্ধজীবকে। আর রামমোহন বলেছেন—

'এই হল এই হবে এই বাসনায়। দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।

মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং।'

এখানে একটা কথা অকপটে বলা চলে যে রামমোহনকে একেশ্বরবাদী দেখে অনেকেই সোচ্চার কণ্ঠে বলে ওঠেন যে তিনি মুসলমান ধর্মের এক আল্লার বিষয়ে পাটনায় পঠন-পাঠনকালে বাল্যেই প্রভাবিত হন—এটা আংশিক সত্যি হলেও তাঁর গীতিকবিতায় সংস্কৃত বাণীচয়নে অপূর্ব অনুরাগ লক্ষ করা যায় সংস্কৃতের প্রতি। উপরের গীতিকবিতার মতো আরো অনেক বাণীরচনায় এরই সমর্থন মিলবে। তিনি এমনভাবে সংস্কৃত ধ্বনিমাধুর্যে ভাবমানসে অনুপ্রবিষ্ট হয়েগিয়েছিলেন যে গদ্য আলোচনায় তো বটেই গীতিকা রচনার কালেও তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এই সংস্কৃত ভাষাশ্লোকের প্রতি অনুরাগ তাঁর ভারত সংস্কৃতির প্রতি মনের প্রগাঢ় অনুরঞ্জনই প্রমাণ করে। যদিও বহু পূর্বেই তা প্রমাণিত যে তিনি নিজে তন্ত্রাসাধনায় গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর নিকট দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর ভাবলোকে ও ভাবনা-প্রবাহে অনর্গলিত চিন্তা—সেখানে সংস্কৃত শ্লোকরাজি অহরহ অনুরণিত অবশ্যই হয়েছে, না হলে তিনি গীতিকবিতার বাণীরচনার কালে এমনিভাবে কি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক সুপ্রযুক্ত করতেন ?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কুমারী কলেট্‌কে লেখা জি. এন. ঠাকুর মহাশয়ের বিবরণে জানা যাচ্ছে—'স্নানের পূর্ব্বে, দুই জন স্থূলকায় ব্যক্তি রামমোহন রায়কে তৈল মর্দ্দন করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র সকল প্রতিদিন পরে পরে আবৃত্তি করিতেন।' এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তা হলে তাঁর যেমন সংস্কৃত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি ব্যাকরণ বিষয়ে অনুরাগও প্রমাণ করে। যার ফলে পরে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা সম্ভব হয়।

রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদী মানসিকতার গঠনের বিষয়ে একটি প্রাচীন নথি এখানে স্থাপন করা চলে যার আলোকে তাঁর গীতিকবিতা পাঠে বিশেষ সহায়ক হবে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহর রায়ের জীবনচরিত' গ্রন্থে 'গৃহদেবতার একত্ব' শিরোনামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত বিবরণটি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেখানে বলা হয়েছে 'বহুদেবত্ববাদ হইতে কিরূপে একেশ্বরবাদে তাঁহার মতির গতি ধাবিত হইয়াছিল, অধিকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আরিষ্টটলের আরবি ভাষায় অনুবাদ পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া, তাঁহার সকল চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য বোধগম্য হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের তত্ত্ব যে প্রকৃত, তাহাও উহাতে দূরীভূত না হইয়াছিল, এমন নয়। তৎপূর্ব্বেও যে ঘটনায় একেশ্বরবাদ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই ;—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোষ্ঠির কুলদেবতা। শিলার নাম "রাজ রাজেশ্বর" বা "রাজাধিরাজ"। এই গোষ্ঠিতে উক্ত দেবতা ব্যতিরেকে অন্য

কোন দেবতার সমাদর ছিল না, এখনও নাই। দুর্গাপূজা, শ্যামাদি কোনও পূজার ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চণ্ডী বিগ্রহ ইত্যাদি পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে, এক ঐ শালগ্রাম ব্যতীত আর কোন দেবতার ঐ বংশে অধিকার নাই। ১লা মাঘ লক্ষ্মীপূজা ব্যতিরিক্ত পৌষাদি নির্দিষ্ট মাসে লক্ষ্মীপূজাও নিষিদ্ধ। অরন্ধনাদি কৌলিক এমন কোন কর্ম্মই নাই, যাহা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেহ ভাবিবেন না, দারিদ্র্যবশতঃ এই গোষ্ঠীতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেকবার অনেকে লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিতে মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। একমাত্র দেবতার অর্চ্চনা যে পরিবারে সম্পাদিত, সেই পরিবারভুক্ত রামমোহন কিশোরেই বুঝিয়াছিলেন—ঈশ্বর এক, বহু নহেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে বলিতেন, আমাদের গোষ্ঠীর দেবতা একমাত্র হওয়াতে, আমরা বাল্য হইতে বুঝিয়া লইতে পারি—ঈশ্বর একমাত্র। যদি কেহ এ কথায় স্বীকৃত হইতে অসম্মত হন, তাঁহাকে একমাত্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—যে বালক, ন্যূনাধিক ষোড়শ বর্ষে একেশ্বরবাদিতা প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, যাঁহার ঐ বয়সে ভোট অর্থাৎ তিব্বত দেশে ভ্রমণাসক্তি বলবতী হইয়াছিল, তাদৃশ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা যেন অসম্ভব হইবে? আনুমানিক এই যুক্তিও আমাদের ত্যাজ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিবার কোন কারণ না পাইলে, উহা কি কারণে অগ্রাহ্য হইবে? গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা পারিবারিক সমাচার বিশেষভাবে রাখিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধ লেখক ও রাজা রামমোহন রায় এক পরিবারভুক্ত পাঠকগণের গোচরার্থে ইহা জানাইতে বাধ্য হইলাম। অন্য যে ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল, তৎসমস্ত লেখক আপন পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির নিকট অবগত হইয়াছেন, ইহা বলিবার নিমিত্তই এই পরিচয় দিতে হইল।' এই উক্তির অতিরিক্ত আরো বলেছেন—'যে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও উহা স্বীকার করিতে শুনিয়াছিলাম।'

এখানে পিতার সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে প্রচলিত ধর্মাচার বিষয়ের মতান্তর এবং মনান্তরের প্রসঙ্গের অবতারণা করে উপরের বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় তো স্বীকার করবেন না। কারণ পরিবারে পালনীয় রীতির মধ্যে নির্যাস রাজা রামমোহন গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা তাঁর নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃত হলেই বোধ হয় বলিষ্ঠ যুক্তির ওপর বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতো। যদিও শোনা-উক্তি রূপে এখানে পারিবারিক কথায় বিধৃত। যাই হোক একেশ্বরবাদী রামমোহন যে ভারতীয় বোধেই উদগীত ছিলেন তা তার গীতিকবিতার আলোকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন—

'দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ। একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।
পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দরশন।
শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বের আশ্রয় হইয়া, সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন।'

রাজা রামমোহন রায়ের এমনি ভাবকে কেন্দ্র করে আর কয়েকটি গীতিকবিতা রয়েছে তবে তার মধ্যে সব থেকে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো শতদল বিকশিত ভাবসমৃদ্ধ রচনাটি উল্লেখ করা যায় এখানে। এটি পড়লে মনে হবে ত্রিপদী ছন্দের বাংলা কবিতা পাঠে আনন্দ পাচ্ছি। স্বল্প কথায় সমৃদ্ধ ভাব প্রকাশিত হয়েছে অন্যগুলির মতোই কিন্তু ত্রিপদী ছত্রগুলিকে একটানা সাজালে মোট ষোল লাইনের কবিতা হয়। নিরঞ্জন ব্রহ্মের বন্দনা করছেন যিনি নিখিল কারণ: তিনি বলেছেন—

'নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধহীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়।
উপমা রহিত, সর্ব্বজনহিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা।
রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা।
জন্মস্থিতিভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মানা বিধি মতে।'

রামমোহনের 'নিত্যনিরঞ্জন নিখিল কারণ' গানটি তাল কাওয়ালি ও রাগিণী বেহাগে গীত হবে বলা আছে। পাঠ করবার সময় উপলব্ধি হবে লেখকের প্রকাশভঙ্গিতে গীতিকার বাণীরচনার বাসনা বর্তমান। অবশ্য প্রতি শব্দনির্ভর ভাবপ্রকাশ গাঢ়তায় বদ্ধ এবং মানসবিচরণশীল ভাবনার সূক্ষ্মস্তরে প্রকাশ অথচ গভীর ব্যঞ্জনার সন্ধান যদিও নেই তবু একটা মনোভঙ্গিকে উপলব্ধি করা চলে। ছোট-ছোট গীতিকবিতায় যে সব ভাব ও ভাষা প্রকাশ পেয়েছে এতে তারই নবরূপায়ণ। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে এটিকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। তাই বলে অন্যগুলিতেও পাঠ্যকবিতার স্বাদ নেই তা নয়, কিছু আস্বাদন পাওয়া যায় তবে সেগুলি গায়ককণ্ঠরূপায়ণেই আরো উপভোগ্য স্বল্প ছত্রে বিধৃত থাকায়। এই ভাবের আর একটির উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে ওপরের ভাবই আরো সংহত রূপ নিয়ে রচিত।

'নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন, সে অতীত ত্রৈগুণ্য।
নবগুণ পুমান শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূতপঞ্চক্তি, সমাধান শূন্য।
কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে অন্ন।
সে সব কল্পনামাত্র, বারবার কহে শাস্ত্র, এক সত্য বিনা অন্য, অন্য নহে মান্য।'

বিষয় বাসনা নিয়ে থাকার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে গৃহস্থীর বিষয় ভাবনা সন্ন্যাসীর ঈশ্বর ভাবনার মতোই। রামমোহন সংসারবদ্ধ হয়েই সংসারাতীত চৈতন্যকে যে পাওয়া যায় তার সাধনাই করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—'তিনি বেদান্ত মতানুযায়ী সংগীতরচনা করে প্রচার করেছিলেন'। তিনি একটি গীতিকবিতায় তা বেশ স্পষ্ট ভাবে বললেন—

'কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে।
ফলশ্রুতি বাণী হৃদবেতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।
সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে।'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখানে কবির ভাব ও ভাষায় বলেছিলেন—

'বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরি দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়ে একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' উক্তির ভাবমূর্তি আমাদের মনে জাগতে পারে। রামমোহন আবার বললেন—

'কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।'

এই সূত্র ধরেই আবার একটি গীতিকায় রামমোহন বললেন—

'ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।'

অথবা যখন বলছেন—

'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়। যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়, সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়।'

সংসারবদ্ধ জীবকে তিনি পরমেশ্বরের প্রীতিতেই জগতের প্রিয় করতে চাইছেন। আত্মবোধ থেকে পরমাত্মবোধে উত্তরণের পথনির্দেশ করে রামমোহন গীতিকবিতার বাণীবন্ধন করেছেন। এ এক ভাবঋদ্ধ ও রসপ্রগাঢ় তাঁর কথাকলি। উপদেশের মতো, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ মনে হলেও যে মৌল ভাবনায় রাজা রামমোহনের মানস-অভিসার তার সত্য-সার্থক রূপই অপূর্ব শিল্পসম্মত নৈপুণ্যে এখানে অভিব্যঞ্জিত দেখা যায়। এই সবই সেই যুগের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। কারণ তখন বৈষ্ণবগীতির পর শাক্তগীতি এবং দাশু রায়ের পাঁচালী আর নিধুবাবুর টপ্পার সবে আবির্ভাব হয়েছে। যমক বাহুল্য আর শব্দের যথাযথ বিন্যাস পদ্যে এসেছে, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের যুগ। এ কথা তো সকলেরই জানা যে, বক্তব্য সমৃদ্ধ যথার্থ বাংলা গদ্যে যা কিছু করার রাজা রামমোহনই প্রথম প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথা অবশ্যই মনে আসতে পারে। তবে তা মিশনারী শিক্ষার মধ্যেই ছিল প্রথমে সীমিত। সর্বস্তরে ব্যাপ্ত তেমন নয়। বিদ্যাসাগরের আগেই রামমোহন যুক্তিনিষ্ঠ যেমন বাংলা গদ্যভঙ্গির প্রবর্তন করলেন তেমনি বাংলা গীতিকবিতাকে নতুন ভাবে প্রকাশ করলেন যা ব্রহ্মসংগীত নামে সেইদিন থেকেই প্রচারিত।

অভিমান আর অহংকার সংসারবদ্ধ জীবের স্বভাব ধর্ম। এর মধ্যেই তার যত কিছু অভীপ্সার উত্তালতা। জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহৎ চাহিদার কাছে পরাস্ত হয়। অভিমান কার প্রতি? কেন? কিসের জন্যে? অহংকারও বৃথা। বৃহতের দিকে দৃষ্টি রেখে পরমশক্তির এক ব্রহ্মের মধ্যে মগ্নচৈতন্য হলে পৃথিবীর আদি অন্ত বুঝতে পারলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় জন্ম-জীবন-মৃত্যু অবহিত হলে সবকিছুর উর্ধ্বে যে শক্তি তার প্রতি অভিমানও চলে না। আর ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে অহংকারও তো চলে না। শুধুই পার্থিব ভোগের মধ্যে শুধুই জীবনধারার বিচিত্র বৈভবের মধ্যে একান্ত আত্ম-অহংকার নিয়ে চলা। উপদেশের মতো আত্মীয় সভায় বা ব্রাহ্ম সমাজের সভার জন্যে রামমোহন রচিত এই সব গীতিকবিতার সুরসমন্বয়ে ভাববাণী। তাঃ তার মধ্যেই থেকে গিয়েছে এমনি উপদেশের মানসিকতা। তিনি বলছেন—

'মনরে ত্যজ অভিমান। যদি হে নিশ্চিত জান রবে না এ প্রাণ।
কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জান না রে, ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।
অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই অনুরাগে করো্যে অহং জ্ঞান।
আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ।'

আদি সমাজ প্রকাশিত 'সঙ্গীতাবলী' ও সাধারণ সমাজের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' সংকলিত —উভয় সংকলনেই এটির রাগিণী সিন্ধুভৈরবী ও তাল আড়াঠেকার অন্যান্য সংগীত-সংগ্রহেও তাই এমনি আর একটি গীতিকবিতা রাগিণী রামকেলী ও তাল আড়াঠেকার, বা পরবর্তী সারদামার কথা মনে আসে নিজের দোষ দেখার কথায়, যেমন—

'দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।'

রাগিণী দেশ ও তাল আড়াঠেকার 'দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ।' গানের কথার আরম্ভের অনুরূপ একটি গানেও পূর্বের ভাবটি অনুসৃত দেখা যায়। রাগিণী আলাইয়া ও তাল ঝাঁপতাল উল্লেখ আছে, সেখানে বলছেন—

'দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন ছুটি নয়। একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়।
হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে, সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয়॥
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়।'

এখানে 'বিধি বিষ্ণু শিব যম' ছত্রটি উল্লেখযোগ্য। শিব শব্দ প্রয়োগ রাজা রামমোহনের ব্রহ্মবাদী মানসিকতায় আবার দেখা গেল। 'ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব না জানিলে নিজ শিব'—এ প্রয়োগও আগে উদ্ধৃত হয়েছে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ ও তাল আড়াঠেকায় গেয় আর একটি গীতিকায়ও এমনি ভাবটি পরিপুষ্ট দেখা যায়, সেখানে বলেছেন—

'মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর। গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভাব্যে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর।'

রাজা রামমোহন রায় একাধিক গীতিকবিতায় ভাববস্তুর রকমফের না করে কেবল প্রকাশভঙ্গির পরিবেশনায় ও কথাবস্তুর প্রয়োগে এবং সুরারোপে (যদি তাঁরই দেওয়া হয়) নতুনত্ব দিয়েছেন। এমনি ধারার উদাহরণ, যেমন—

'দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান। আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান
সকল শরীর ব্যাপী যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে কেমন প্রকার,
অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান।'

রাগ গৌড়মল্লার ও তাল ধামালে গেয় 'স্মর পরমেশ্বরে মন আমার' গীতিকার শেষছত্রে অন্তরায় বলছেন—'ত্যজ আশা অহঙ্কার।' কিংবা যখন গীত রাগিণী বাগেশ্রীতে ও তাল একতালায়—

'স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।'

অল্প কথা। কিন্তু অর্থবহ। বিবেক বৈরাগ্যের প্রয়োজন বিষয়ের দুঃখ থেকে বিষয়ীর উত্তরণে—সেখানেই উপাসনার বাণী নির্গলিত যেন। যন্ত্রণামুক্ত মনকে রামমোহন উপাসনায় প্রার্থিত জ্ঞান করছেন,অনাদি অনন্ত পরম ঈশ্বর চিন্তায় ভবযন্ত্রণার বন্ধনও ছিন্ন হবে।

ত্রিগুণাতীতের ধ্যানে রামমোহন ছিলেন ধ্যানী। ব্রহ্মার নিরাকার এবং সেই থেকে এই মূর্তি-পূজার বিরোধি রামমোহন বলছেন—

'নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে, যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর, মন জান না।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, শ্রবণমনন তাঁরি, কর সূচনা।'

রাগিণী ভৈরবী ও তাল আড়াঠেকায় গেয় বলে উল্লেখ রয়েছে 'সঙ্গীতাবলী' 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ইত্যাদি সংগ্রহে। 'বেদবিধির অন্তর, মন জান না' বলে রামমোহন সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন যা বিশেষ ইঙ্গিতবহ। রাগিণী আলাইয়া ও তাল আড়ায় গেয় 'কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ' গীতিকায়ও অন্তরা অংশে রামমোহন বলেছেন— 'সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা'।

রামমোহন সকল সময়ে আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে পরম প্রার্থিতের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। অনুসন্ধানী মনের কথায় রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়াঠেকায় গেয় গীতিকাটিতে তাই বলছেন—

'সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে, কর বিসর্জ্জন।
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ।
জানে যত্ন নাহি হয়, পক্ষে করি নিশ্চয়, সে পক্ষ প্রপঞ্চময় না জান কি মন।'

যদিও এ কথা সংসারী বা বিষয়ী তো ভাবে না, তাই নানা মত ও পথ নিয়ে চলে, নানা মতো কথায় বৈচিত্র্যের জাল বোনে। বাউল কণ্ঠের ধ্বনি যেন এখানে প্রকাশ ভঙ্গি ও উপমায়। এমনি সুন্দর আর একটি গীতিকার উল্লেখ করা যায়। রামমোহন রায় এমনি ভ্রমনশীল মনের ভাবনায় গৌড়মল্লার ও তাল আড়াঠেকায় গীত হবার একটি গীতিকবিতায় বলছেন—

'সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।
যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মার্জ্জিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন।'

রাগিণী রামকেলী ও তাল আড়াঠেকার ব্যবহার বলা হয়েছে এই নিয়ের গীতিকবিতাটিতে। সুন্দর চিত্রধর্মী ভাবমূর্তি প্রথম ছত্র থেকেই—

'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।
শ্যামকেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ, হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার কককাশ দুর্নিবার, হস্তপদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে।'

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন (পৃঃ ২৭২)—'তাঁহার বাব্‌রী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন; প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। তজ্জন্য একদিবস তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন "মহাশয়! 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' এই গীতটি কি কেবল পরের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন?" রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বেয়াদার ঠিক বলিয়াছ, ঠিক্ বলিয়াছ।"...।' রামমোহনের সৌজন্যবোধ এবং সৌন্দর্যপ্রিয় মনের ইঙ্গিত এই ঘটনায় ধরা হয়ে আছে। তবে সঠিক কিনা বলা যায় না তবু মুদ্রিত পুস্তকের প্রাচীনতায় এ সব ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে সত্যরূপে স্বীকৃতি

দেওয়া চলে। সমসাময়িক বা তাঁর ঠিক পরবর্তী অনুরাগী জনের উক্তিই এ ক্ষেত্রেও বর্তমানে একমাত্র ও একান্ত নির্ভরস্থল।

২৩ জানুয়ারী ১৮৩০ ব্রাহ্মসমাজের জোড়াসাঁকোয় নিজস্ব গৃহে উদ্বোধন উৎসব হয়। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার জন্যে প্রথম সভা হয় ২০ আগষ্ট ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন থেকেই সেই সভায় রামমোহন প্রবর্তন করেন, বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার পর সঙ্গীত হবে সভাভঙ্গ করার রেওয়াজ। মহর্ষিদেব বলেছেন—'ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু [চক্রবর্তী] গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। "বিগতবিশেষং" সঙ্গীতটি রাজার অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটি মধুর স্বরে গান করিতেন।'

মহর্ষিদেব আরো লিখছেন—'সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে, তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন।·· এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতা সকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল কবিতার ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা উচ্চারণ করিতেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা ছিল।' এই ঘটনাটিতে যেমন রাজার ছন্দিত শ্লোকের আবৃত্তির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তেমনি মহর্ষির উল্লিখিত আর একটি ঘটনায় তাঁর প্রগাঢ় সঙ্গীত প্রীতির পরিচয় রয়েছে।

মহর্ষি লিখছেন—'তিনি রমাপ্রসাদকে তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত সঙ্গীত "অজরমশোকং অসদামোকং" গান করিতে বলিলেন। রমাপ্রসাদ বড়ই লজ্জায় পড়িলেন। তিনি গান করিতেও পারেন না, আবার তাঁহার পিতার আজ্ঞা অগ্রাহ্যও করিতে পারেন না। তিনি আস্তে আস্তে খাটের নীচে গিবা বসিলেন, এবং তথায় করুণাব্যঞ্জকস্বরে গান আরম্ভ করিলেন।' পুত্রকে গানে নিযুক্তিতে পারিবারিক জীবনে গান রামমোহনের একান্ত অন্তরঙ্গই ছিল বোঝা যায়।

রাজার জীবনীকারও তাঁর একান্ত সংগীত প্রীতির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—'সমাজে বিষ্ণু যখন গান করিতেন, তাঁহার গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহার সম্মুখে কেহ একটি সুভাবের কথা বলিলে বা সুসঙ্গীত গান করিলে, তিনি ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন।' আত্মীয় সভায়ও রামমোহন সপ্তাহে একদিন মাণিকতলার বাড়িতে শিবপ্রসাদ মিশ্রকে দিয়ে বেদপাঠ ও গোবিন্দ মালাকে দিয়ে ব্রহ্মসংগীত করাতেন। ব্রাহ্মসমাজের সভাতেও বেদ-উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যার পর সংগীত হয়ে সভাভঙ্গ হত রামমোহনের সময়েই। রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীড রচনা করেন তাতে বলেছিলেন—'যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, এই

সাধারণের মিলন মন্দিরের দ্বার তাঁহারই জন্ম উন্মুক্ত তিনি যে দেশের যে জাতির বা যে ধর্ম্মের লোকই হউন না কেন?' এই সমাজ গঠনের মৌল বক্তব্য রচনাতেও তিনি সংগীতকে একটি বিশেষ স্থান দিয়ে লিখছেন—'যে কোন জীবিত বা মৃত পদার্থ কোন মনুষ্যের বা সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বলিয়া বিবেচিত বা ব্যবহৃত হইয়াছে বা পরে হইবে, এখানকার ধর্ম্মোপদেশে, বক্তৃতাতে, সঙ্গীত, উপাসনা সম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যে অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তাহার কোন উল্লেখ করা হইবে না বা তাহার কোন নিন্দাবাদ করা হইবে না।' রামমোহন উদার আলোকে উদ্ভাসিত অন্তরে এই ঘোষণাপত্র সেদিন রচনা করেন। এর মধ্যে আবার বলছেন সংগীতকে বিশেষ স্থান দিয়ে—'প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি ভিন্ন অন্য প্রকারের কিছু এখানে হইতে পারিবে না।'

'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শশিভূষণ বসু উদ্ধৃত করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে; যেখানে বলা হয়েছে—'তাঁহার জীবনের এই মহান লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে।' এখানে অনেকেরই মনে আসবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বোধিত রামমোহনের কথা; যিনি স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তন হওয়ায় কলকাতার টাউন হলে ভোজসভার আয়োজন করেন। নেপলস্ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজয় সংবাদে কলকাতায় বকল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই গেলেন না। ফরাসী বিপ্লবের সংবাদের জন্ম তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল। গ্রীস-তুরস্ক সংগ্রামে গ্রীসের প্রতি কি গভীর সহানুভূতি! তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃসংঘ স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে প্রস্তাব পাঠান। বিলাত গমনকালে স্বাধীন ফরাসী রাষ্ট্রের জাহাজে পতাকা অভিবাদন করতে যাওয়ার আগ্রহ-আতিশয্যের ফলে আচমকা তাঁর পায়ে চোট লাগার ঘটনাও এই সূত্রে বিশেষভাবেই স্মরণে আসতে পারে।

'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' নামের পুস্তিকায় নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং জীবনচরিত গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজার নামে প্রচারিত একটি গীতিকবিতাকে উল্লেখ করেছেন রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের রচনা বলে। রামমোহন বিলাত যাত্রা কালে রাজারাম এবং অপর দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে যান, একজন রামদাস মালী অপরজন রামরত্ন মুখোপাধ্যায়। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখছেন যে—'রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি আপন নামের নাম রাখেন। রামরতনের পূর্ব্বনাম—শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম—হরিদাস।' এমন উচ্চগ্রামে আপন পারিপার্শ্বিকতা রচনা করে সমুদ্রযাত্রায় অগ্রসর হলেন রাজা রামমোহন যখন হিন্দুর সংস্কারে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলে প্রচারিত ছিল। নন্দমোহন লিখছেন—'ইংলণ্ড গমনকালীন একদা ভারত-সাগরে তাঁহাদের জলযান ঘোর ঝড়ে মহা ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয়। এ

সময়ে সকলকেই জীবনাশায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। রামমোহন তখন সহচরবর্গকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন।' এই সময়ে রামরতন একটি গান রচনা করেন বলে গানটির উল্লেখ দেখা যায়।

'ওহে কোথায় আনিলে, আনিয়ে জলধিমাঝে তরঙ্গে তরি ডুবালে।
কোথা রইল মাতাপিতা, কে করে স্নেহ মমতা, প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে
চতুর্দ্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার, প্রাণ বুঝি যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।'

ভাবে বা ভাষায় রামমোহনের প্রচণ্ড প্রভাব এবং অত্যন্ত সহজ সুরে মনের একান্ত উত্থিত ভাবনার ছন্দিত প্রকাশ এটি ঠিকই, তবে যিনি কখনও কিছু রচনা করেন নি তাঁর পক্ষে কি সম্ভব ? এমন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে এবং জাগাই স্বাভাবিক। তবে রামমোহনের অনুকরণে বা অনুসরণে তো বহু ব্রহ্মসংগীত সে যুগে রচিত হয় যা নানা সংগীত সংকলন গ্রন্থে গ্রথিত।

'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখছেন—'রামমোহন রায় ইংলণ্ডীয় সমাজের সহিত বিশেষরূপে মিশিয়াছিলেন। সকলপ্রকার সামাজিক আমোদ-প্রমোদেও অবকাশানুসারে যোগ দিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তিনি এক দিবস তাঁহার বন্ধুগণের সহিত আস্‌লিস্‌ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গ্রন্থকার যে পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তার কোনো অংশ উদ্ধৃতিসহ বক্তব্য উপস্থাপিত করেন নি। এর পরই লিখছেন—'রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য ছিল। একদিকে যেমন তিনি গম্ভীর স্বভাব, অন্যদিকে, আবার, সুরসিক, আমোদপ্রিয়। কাব্যরসাস্বাদনে, নাটকাদির মাধুর্য্যগ্রহণে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। কাব্যরসে পরিতৃপ্ত হইতেন।'

রামমোহনের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য চরিত্রের অন্তরালে অন্তরে সদা ফল্গুধারার মতোই যে ললিত-কলার প্রতিও অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ঘটনার যে উল্লেখ গ্রন্থকার করছেন, তা এই—'বেসিল মণ্টেগু সাহেবের বাটীতে, রামমোহন রায়ের সহিত একজন তৎকালীন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী, ফ্যানি কেম্বলের (Fanny Kemble) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কোন কোন হিন্দু নাটকের বিষয় অবগত আছেন দেখিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'শকুন্তলা' নাটকের বিষয় অবগত নহেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রাজা মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শকুন্তলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।··· রাজা তাঁহাকে পরে, সর্ উইলিয়ম জোন্‌সের অনুবাদিত শকুন্তলা একখণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন।·· ১৮৩১ সালে ২২শে ডিসেম্বর দিবসের দৈনন্দিন লিপিতে ফ্যানি কেম্বল লিখিয়াছিলেন যে,রাজা তাঁহাদের নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। সেদিন ইজাবেলা নামক নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ডিভনসায়ারের ডিউকের বসিবার স্থানে রাজা বসিয়াছিলেন। তিনি নাটকাভিনয়

দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। উক্ত অভিনেত্রী, তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে, আর এক দিনের কথা লিখিয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মার্চ, মণ্টেগুদের বাটীতে অনেকগুলি ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ফ্যানি কেম্বল তথায় এক ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়াছিলেন। রাজা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফ্যানি কেম্বল আরও লিখিয়াছেন যে, রাজার সহিত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল। উহাতে তিনি (ফ্যানি কেম্বল) অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত অভিনেত্রী, আরও বলিতেছেন; তাঁহার (রাজার) মূর্ত্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। লণ্ডনের যে সকল গৃহে নৃত্যাদি হয় (Ball-rooms) তথায় তাঁহার সুচিত্রিত পোষাক ও তাঁহার বর্ণ, তাঁহাকে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় করিয়াছে। তাঁহার আকৃতিতে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় মধুরতা ও শান্তভাব প্রকাশ করে। ফ্যানি কেম্বল বলিতেছেন যে, রাজার সহিত হাস্যরসাত্মক কথোপকথনে তাঁহারা উভয়েই অতিশয় হাস্য করিয়াছিলেন। অভিনেত্রী বলিতেছেন যে, এই সাক্ষাতের তিন দিবস পরে, তিনি রাজার নিকট হইতে একখানি মনোরম পত্র ও কয়েকখানি ভারতবর্ষীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গের আর একটি নজির দিয়েছেন—'১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী ফিডেলকে লিখিতেছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে সায়াহ্নে আস্‌লিস থিয়েটারে গমন করিবেন।' [পৃঃ ২৫৪]

এই উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে দুটি জিনিস বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি হল রাজা রামমোহন রায়ের সমস্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যে একটি ভাবপ্রবণ সহানুভূতি-সম্পন্ন রসিক চিত্ত বর্তমান ছিল। দেশের দশের প্রয়োজনে নিরস প্রসঙ্গের তর্কবিতর্কে শক্তিকে প্রযোজিত করলেও তিনি কিন্তু নাট্যরস উপভোগে, কাব্যরস গ্রহণে এবং সহজ রসিকতার আকর্ষণীয় পুরুষই ছিলেন। তাঁর চিত্ত ভরা ছিল ললিতকলার রূপাভিসারেও। তাই তাঁর জীবনধারায় ও পরিবেশ রচনায় তারই প্রকাশ—তিনি সুন্দর সাজপোষাকে ও সুদৃশ্য গৃহাঙ্গন রচনায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁর মাণিকতলায় বাসভবন যেভাবে রেখেছিলেন তার উল্লেখ মহর্ষিরও আত্মচরিতে করেছেন।

'আমি মানিকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যান বাটিকাতে প্রায়ই গমন করিতাম। ··রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোলনা ছিল।···আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।' তিনি আরও লিখছেন—'রাজার মাণিকতলার বাগানে অনেক উত্তম উত্তম ফলের গাছ ছিল।'

এমনি রামমোহনের আর একটি ঘটনার উল্লেখ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন ৩৭ পৃষ্ঠায়। এইটি ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনায় বলেছেন—'১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি পার্টিতে

গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজী-পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল ·· উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।' এই আলো ঝলমলে নিপুণ নৃত্যের চাঞ্চল্যের সান্ধ্যসমাবেশ গৃহাঙ্গনে। সমকালের বুকে সমঝদারীর তৎকালিক আভিজাত্য সম্পন্ন মানসিকতা।

রামমোহন তাঁর কলকাতার জীবনেও অভিজাত সেকালের সংগীতনৃত্যপ্রিয় ও জমকালো উৎসবপ্রিয় মানসিকতাকে বজায় রেখেছিলেন। তাঁর জীবন এবং মনন দুটিই বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত ছিল। তিনি সমাজজীবনে সমকালের উন্নত রুচির মধ্যে এবং মানসমননে পরিচ্ছন্ন উদার চৈতন্যে স্থিতধি থাকতে চেয়েছিলেন। নিজের উদার হৃদয়ের উত্তরীয় সুবিস্তৃত করেছিলেন দরাজভাবে—দেশ, জাতি, নিজের ধর্ম, ভাষা—কোনো কিছুরই আর প্রাচীর তোলার অবকাশ ছিল না। হৃদয় ভরে আলিঙ্গন করেছেন সকলকে। সূক্ষ্ম কলারসিক রামমোহন তাই সংগীতপ্রিয় এবং সুরে উধাও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনচর্যা তাঁর আচার-ব্যবহারে, তাঁর আদর্শচর্চায় এই পরিশীলিত নাগরিক মানসবৈভবে বিভূষিত রামমোহন উন্নত ও উল্লেখযোগ্য মানুষ। তিনি অন্তরের সহৃদয়তায় ও সৌজন্যে পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি ন্যায়নীতির নৈষ্ঠিকতায় নিমগ্ন। তাঁর স্বদেশের যাঁরা অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন এবং বিদেশেরও অন্তরঙ্গ মহল এ কথার সমর্থন বারবার করেছেন; আন্তরিকতার সুভদ্র সংস্কৃতিবান পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—'সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাবত অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। অসংখ্য লোক তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করিতে আসিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ কথা সকল বলিয়া তর্ক করিতেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও কখনও চলিয়া যাইতে বলিতে পারিতেন না। তিনি সকলের কথা ভদ্রভাবে মনযোগপূর্ব্বক শুনিতেন।' রাজার বাগান যে সাজানো ছিল তা মহর্ষিদেব একটি কথায় উল্লেখ করেছেন—'রাজার এই বাগান, তাহার মালী রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল।' যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বড়ই নির্বোধের মতন কথা বলছে দেখতেন, তিনি তখন বলতেন—'আপনি কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়ালে হয় না?' বাস আর কোনো কটু কথা নয়। এই বলে তিনি বাইরে বাগানে বেড়াতে আরম্ভ করতেন দ্রুতবেগে—সে লোকটি কিন্তু অত দ্রুতবেগে ভ্রমণে অক্ষম হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হতেন। ঘটনাটি সামান্য হলেও একটা অসামান্য সৌজন্য প্রকাশের পরিচায়ক। তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে পালিত পুত্র রাজারামের দুরন্তপনার ঘটনাও এখানে একটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিদ্রার সময় প্রায়ই রাজারাম তাঁর বুকের ওপর ঝাপিয়ে উঠতো। নিদ্রার ব্যাঘাত হলেও তিনি

'রাজারাম' 'রাজারাম' বলেই জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। কোনো কষ্টমনের ভাবপ্রকাশ করতেন না। মহর্ষির আর একটি উক্তিও বিশেষ স্মরণীয়—'রাজার এমন এক শক্তি ছিল, যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন।'

অপ্রচলিত রাগিণী লুম ঝিঁঝিট ও প্রচলিত তাল আড়াঠেকায় গেয় একটি গীতিকায় রামমোহন তাই সেদিন বলেছেন—

'চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন, আকাশ পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন। কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে, আত্ম তত্ত্ব মর্ম্মজ্ঞান কর্ম্ম মিথ্যা কার জ্ঞান।'

অথবা রাগিণী কালাংড়া ও তার আড়াঠেকায় গেয় আর একটি—

'মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি শুদ্ধ ভাবে।
ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।'

এখানে রবীন্দ্রনাথের আর একভাবের অভিব্যক্তির বাণীবচন মনে আসে, যেখানে বলেছেন—'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়াছ যে ঠাঁই।' সেখানে প্রেমকবির অভিব্যঞ্জনা আর এখানে গভীর আধ্যাত্মবোধের অনুরণন।

'গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরেৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।'

রবীন্দ্রনাথের 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' যেমন বলা বা 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান' এখন বহুল ভাবে প্রচারিত কিন্তু পূর্বে যে 'বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে' বলার কথায় যথার্থই দীক্ষিত করেছেন রামমোহন রায়—তা স্মরণে হয়তো সবারই আসে না সচরাচর। অবশ্য পরিপূর্ণ বৈরাগ্য কবির নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। তাঁর অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির আনন্দ। এই যেমন মনের রামমোহনও।

রামমোহন-জীবনে এমন একটা সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও সৌন্দর্যরূপের সাধনায় মন, মত ও আদর্শকে পরিচালিত করতেন যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ স্থূলবুদ্ধির মানুষ নানা কদর্থ ব্যাখ্যায় তৎপর হয়ে উঠতেন। শ্রীমতী দেবী ছিলেন রাজা রামমোহনের মধ্যমা স্ত্রী। তাঁরই দুইপুত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। রামমোহন স্ত্রীলোকের যেমন স্বামীর সঙ্গে সহমরণ পছন্দ করেন নি তেমনি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে মুখাগ্নি করাও রুচি বিরুদ্ধ মনে করেছিলেন। হয় তো তাঁর এটিকে একটি অসংস্কৃত অসভ্য প্রথামাত্র বলেই মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে স্ত্রীলোক পর্দার অন্তরালবর্তী থাকেন তিনিই হঠাৎ মৃত্যুর পরেই প্রকাশ্য দিবালোকে বীভৎস ভাবে আত্মজনের দ্বারা অগ্নিদগ্ধ হন—এ কেমন! এই প্রসঙ্গে নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়

লিখেছেন—'শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু-সংবাদ আসিল। রামমোহন স্ত্রীবিয়োগে শোকান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ-রসে রসজ্ঞ ব্যক্তির সে দুঃখ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তিনি অভয়দাতার অভয়-নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া গীতও করিলেন—

'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।'
রাগিণী রামকেলী ও তাল আড়াঠেকায় গেয় এই গানটির রচনার প্রেরণাস্থল এই ভাবের হোক আর নাই হোক এমন সহজ অনুভবের ভাবানুভূতি সমাজজীবীর অনস্বীকার্য সত্য এবং অনিবার্য রূপে গ্রাহ্য। পরের কলিগুলিও স্মরণীয়—

'যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।'

একই সুর-তালের আর একটি একেবারে নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকের রামমোহন-গীতিকা এখানেও এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য, যেখানে বলেছেন—

'একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। তবে এত আশা কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ।'

জীবে প্রেম সত্যে শরণ রামমোহন ধ্রুবপদ রূপে ধারণ করেন সর্বক্ষেত্রে। ফলে রামমোহনের মননধর্মে ছিল আশাবাদ, তিনি মায়াবাদী নন। রাগিণী রামকেলী তাল আড়াঠেকার এমনই একটি গীতে তাই বললেন—

'একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।
মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে।
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে।'

জাগতিক জীবনমার্গের সারভূত নির্যাস বাণী ধ্বনিত অলঙ্কৃতভাবেই। শিশু অসহায়, বৃদ্ধও। জীবনের শরীরগত অপুটতা বার্দ্ধক্যের অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে হতচেতন হওয়া নয়, তা থেকে উত্তরণ হবে পরহিতে মানসিক অভিনিবেশে। অনুরূপ সুরেতালে গেয় গীতিকবিতায় আবার রামমোহন বলছেন—

'অনিত্য বিষয়কর সর্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অগ্রে পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন।'

হাসি অশ্রুর দোলদোলানো জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এটি এবং চরম সত্য। বিষয় বস্তুর একান্ত মনের কথায় একান্তের অনুভব, ঐকান্তিক অনুভূতি।

শেষ স্মরণীয় রূপে রামমোহন 'ভাব সেই একে'র গীতিকার বাণীই উচ্চারণ করলেন।

অনিত্য সংসার নয় নিত্য সংসারে চিত্ত ভরে দিচ্ছেন পরহিতের ব্রত, সত্যের শরণ এবং আত্মার এক পরমাত্মাকে চরম বন্ধু ভাবার দীক্ষা।

রামমোহন-গীতি—এ একেবারে একের হৃদয়-আর্তি একের জন্যেই একান্তভাবের। এই ভাবের প্রকৃষ্ট বন্ধনে গীতিকায় ভাব-বস্তু প্রভাবিতই। গানের গভীরে গীতিকার গায়কীর সঙ্গে গায়ন বক্তব্যও গহন হৃদয়ের। রামমোহন জীবন ও জগতের জ্যোতির্ময় চৈতন্যে চেতনার সঞ্চার করেছেন গীতিগাথায়। তাঁর গীতি-কথা সাধনসিদ্ধ পুরুষের পৌরুষদীপ্ত উক্তি। এবং এমনই এক ও একক চিন্তার মানসিকতায় উদ্গীত। আর এই একক ভাবই গীতিকবিতার প্রাণপ্রতিমা। তিনি উচ্চাংগের বাণী-উপযোগী সুরসমন্বিত ও তাললয় মার্জিত প্রয়োগে এক অখণ্ড-সাংগীতিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন গীতিকায়। তাই বাংলা গানের কথায় ও সুরে এবং ভাব ও ভাবনায় যথার্থ সাধন-ঐশ্বর্যে ঐতিহ্যসঞ্চার করেছে। এই বিশ্বাস নিয়ে বলা যা বাংলা সাধনসংগীত বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় যেমন দিকচিহ্ন হয়েছে তেমনি ভাবসাধনার সাংগীতিক মাধ্যমে ব্যঞ্জনায় ও ব্যাখ্যায় যথার্থই বিবর্তিত কালের সাক্ষী।

রামমোহন-গীতি বাংলা ভক্তিগীতির মার্গে চর্যাপদ থেকে ধরে ধারাবাহী পরিচর্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্মালাই। এককে নিয়ে একান্ত কক্ষে অনেকের একই হৃদয়-আর্তি।

এবং নবজাগৃতির ভাববিভূতি। তবে ভাষায় শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাস তৎকালীন বাংলার সদ্য সংগঠনকালের একান্ত আটপৌরে কলকাত্তাই ভাষায় যা এখন আধুনিকায়নের চলতি বাংলায় কিছু অচল। তবে ভাবসাধনার মৌল বক্তব্য চলমান কালের এবং চিরকালীন। যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধারারই প্রবহমানতায়।

গানের গহনে প্রাণের প্রণয়। তাই প্রকৃতই প্রকৃতির পরিচয়। এরই বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য সুর-তালে কথার গীতিকা আর শতাব্দীর সুবর্ণময় স্মরণিকার উদ্গীতি। যার মূলাধারে রামমোহনের জাগ্রত চৈতন্যের উদার হৃদয়ের পরিশীলিত সুরবিস্তার দেশের এবং বিশ্বের, সমগ্র মানবধর্মের মুক্তি মুক্তমনের প্রাঙ্গণে।

মুক্তি তাঁর সংগীত কথায় এবং কথার গীতিকায়।

জীবন তাঁর তো কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায় ঝড় বইয়ে দেওয়া।

রাজা রামমোহন একদিকে একেশ্বরবাদী 'একমেবদ্বিতীয়মে' বিশ্বাসী আবার বহু মানবমনের মধ্যে একসূত্রের বন্ধনের মতন মহৎ কার্যাবলীর প্রস্তাবক। নারীর মর্যাদায় সতীদাহের মতবাদ অর্বাচীন জ্ঞান করেন যেমন, পৌরুষপ্রদীপ্তির মহিমায় স্বাধীনচেতাও তেমনিই। তাঁর সংবাদপত্র সম্পাদনায় নিরপেক্ষতা ছিল আর সংবাদ-পত্রের প্রকাশের মতবাদের স্বাধীনতাজ্ঞানও। স্বাধীনচিত্তের জয়ঘোষনায় তিনি তাই ছিলেন অভিযাত্রী কারণ তিনি তো এক মুক্তিমন্ত্রের মানুষ। মুক্তমনের অগ্রদূত। রবীন্দ্রসংগীতেরই উচ্চারণে বলা চলে। যেখানে—

'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।'

বৈশাখী ঝাপটেই খোলো হাওয়ার প্রবাহ রামমোহনের। সে মনমে জাগৃতির নজির নজরে। আর তাই যে মন ও মানসিকতা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে চলেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা শ্রীরামকৃষ্ণে, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দে, শ্রীঅরবিন্দ বা সুভাষচন্দ্রে ; তারই তো বিশ্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এক উজ্জ্বল আলোকে. বর্ণাঢ্য বিভূতিতে, পূর্ণ জাগৃতির দীপ্তিতে, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে ও স্বাধীন চিন্তাতে ভরা ভারত-ভাবনার অভাবনীয় আলেখ্য।

৪

নবজাগৃতির আলোকে রামমোহন

পাশ্চাত্ত্যের 'রেনেসাঁন্স' ফেলে আসা এক শতাব্দীর উজ্জ্বল অভিধাই।

আমাদের মানস-আলোকে নবজাগরণ চিহ্নিত চিত্র তুলে ধরতে পারে অবশ্যই। তাই তারই অন্বেষণে উপনীত হতে হয় আমাদের দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রায় প্রথম পাদের উত্তরণের কালেই। তখন বঙ্গের হুগলী জেলার রাধানগর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক স্বনামধন্য সন্তানের কথাই স্মরণীয়। রামকান্ত রায়ের তিনি অন্যতম সন্তান। তার জ্যেষ্ঠ ছিলেন যিনি তাঁর নাম জগমোহন। এই রায় তাঁদের প্রদত্ত উপাধি। তাঁর প্রপিতামহ এক কালে তখন ছিলেন ফুরথশিয়ারের শাসন অধীনের বাংলার সুবেদারের পদস্থ আমিন বিশেষ। সেকালীন রেওয়াজের সূত্র সন্ধানে জানা যায় এই বন্দ্যোপাধ্যায় কৌল উপাধির অবলুপ্তি এবং রায় পদমর্যাদার পদবীয়ানার বাহুল্য-যুক্তি। এবং এটিই হয়ে যায় তখন থেকেই বংশাবলীর ব্যবহার-যোগ্য এক যথাযথ পরিচায়িকার।

রাধানগরের রায় বংশের রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত ছিলেন রায় উপাধির শীর্ষের বিন্দু। তাঁর থেকে যে উৎসধারা তারই উদ্বেল উপস্থিতির যে ঐতিহাসিক অবস্থিতি সেখানের চিহ্নিত পুরুষ রামমোহন। তবে পারিবারিক যে বিপর্যয় তাও জীবনীকারদের অনুসন্ধানে অনুদ্ঘাটিত নয়। সম্ভবত উনিশ শতকের পদার্পণলগ্নেই তাঁর পিতৃদেবকে কারাবরণ করতে হয় হুগলী জেলার দেওয়ানী মামলায় বিজড়িত হয়ে আর তার পরেই একই হেতুতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাগ্যেও ঘটে আবদ্ধের জেল-জীবন মেদিনীপুর জেলায়। তবে সব থেকে যা সুখবর তা হচ্ছে, এই অসম্মান তৎকালীন অন্যায়-অবিচারের শাসনে রামমোহনকে আর করায়ত্ত করতে পারে নি। এই সব ঘটনার আগেই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দু-দুটি তালুক ক্রয় করেছেন ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের বারোই জুলাই তারিখেই। অবশ্য তাঁর আগের অনেক সময়েই পৈতৃক বিপুল জমিদারীর দেখাশোনার কথাও আছে যা তিনি তার ভ্রাতাদের সতীর্থ রূপে

হাতে-নাতে মগ্ন করেছেন। ১৭৯১ খৃস্টাব্দ থেকে লাঙুলপাড়া গ্রামের বসত বাড়ি করেন তাঁর পিতৃদেব কিন্তু বৈষয়িক কাজকর্মে তিনি এই পিতৃবাসের লাঙুলপাড়ায় যেমন থেকেছেন তেমনি বর্ধমানে আর কলকাতাতেও। ১৭৯৬ খৃস্টাব্দে তিনি তো কলকাতায় জমি, বাগান এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ি—যা পৈতৃক সূত্রের কোনোটা আবার অন্যান্য সূত্রেরও কোনোটা মালিকানায় এই সব পান। এই প্রাপ্তিযোগে তাঁর ঘটে কলকাতার অভিজাত সমাজের শীর্ষস্থানের প্রবেশ পত্রই। তিনি ১৮১৪ খৃস্টাব্দের কোনো এক সময় থেকে কলকাতাবাসী হন। ক্রয় করেন চৌরঙ্গীর বাড়ি আর মানিকতলার আদত কলদাতার বসত বাড়ি বাগানসহ। রামমোহন রায় কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক তখন থেকেই।

তাঁর কলকাতার জীবনসূচনাই তাঁকে করে তোলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের এক ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের পুরোহিত। তিনি কর্মজীবনে শোনা যাচ্ছে ১৮০৩ খৃস্টাব্দের সাতুই মার্চ থেকে মাত্র দুমাসের মতন নাকি দেওয়ানের কাজও করেন যশোহরে। সেখানে তখন উড়ফোর্ড ছিলেন কালেক্টর। এবং এর পর ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আবার সিভিলিয়ান ডিগবীর দেওয়ানও ছিলেন। এই সময়ের জীবন-ধারায় ও মননশীলতায় যথার্থ পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক প্রকাশকে প্রভাবিত করে তাঁর প্রাচ্যশিক্ষার আদি প্রেক্ষাপটেই। তাঁর মধ্যে ঘটে আধুনিকায়নের সমন্বয় দর্শনের ও বিশ্বমুখীনতারই বোধের উদয়। তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন নবজাগৃতির আলোকে। তিনি জাতির জীবনচর্যায় ও মানসচর্চায় প্রবক্তা হন নবজাগরণের।

এই ইংরেজ পুরুষের সঙ্গে জনসংযোগের জীবনে তিনি সকল সময়েই ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাঁর আত্মসম্মান বোধ ছিল অত্যন্ত সজাগ। অনেক বিষয়ের কথা অনেক ভাবেই তা আলোচিত। এখানে স্মরণ করা যায় স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন সাহেবের সঙ্গে বিরোধের প্রসঙ্গ। তিনি সরাসরি লর্ড মিন্টোর কাছে ১৮০৯ খৃস্টাব্দের বারোই এপ্রিল এক দীপ্ত অভিযোগপত্র লিখে পাঠালেন। এই পত্রটি প্রথম ইংরেজি রচনা রামমোহনের বলেই যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনিই এই পত্রই প্রথম ভারতবাসীর প্রতিবাদপত্র বৃটিশ রাজপুরুষ সমীপে। তাই রামমোহনের স্বাজাত্য বোধের এবং স্বাধীনচিত্তের প্রকাশবাহী নিদর্শনরূপে এ এক প্রকাণ্ড ঘটনা।

তাঁর জীবন ও জীবনীর দিকে সুনজর দিলে প্রথমেই বলার তিনি ভারতীয় মানসে আধুনিকতার অগ্রদূত এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শপুরুষ। তাঁর উন্নত জীবনাযনের প্রবক্তার ভূমিকায় প্রথম শিক্ষা একদিকে পাটনায় আরবী ভাষায় অন্যদিকে কাশীতে সংস্কৃত ভাষায়। নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার পরে হন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, তিনি ছিলেন তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক থেকে অনেকেই বলেন দীক্ষাগুরুও হয়-তো-বা। তাঁরই কাছে রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও ভারতীয় ধর্মদর্শনের মূলচর্চার সূচনা। তিনিই তাঁর অন্তর্লোকে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের সহায়ক হন। শোনা যায় যে, মাত্র পনেরো বছর বয়সের সময় তিনি ভূপর্যটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিব্বত ভ্রমণের কথাও শোনা।

তবে তাঁর স্বরচিত উচ্চারণ এমনিই—'পৃথীবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে' পদচারণা করার কথা। সে যাই হোক, বাইরের আলোয় তিনি ক্রমেই আলোকিত হয়ে উঠেছিলেন আর ঘরের নেভানো আলোকেই প্রজ্বলিত করেছিলেন।

রামমোহন একেশ্বরবাদী আজন্ম। অনুমান করা হয় ১৮০৩ বা ৪ খৃস্টাব্দেই তিনি 'তুহ্ফাৎ উল মুবাহহিদ্দীন' নামের রচনা আরবী ও ফারসী ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন, যার আলোচ্যবিষয় ছিল একেশ্বরবাদ। এটি তাঁর মুর্শিদাবাদে থাকা কালে প্রকাশ পায়। তবে কলকাতায় বসতিই তাঁর নানা কর্মের ও মর্মের, নানান বৈচিত্র্যের পরিমণ্ডলে কর্মধারাকে রূপায়িত হয়ে ওঠায় সহায়তা করে। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে এবং বিশ্বধর্মে বিশ্বাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদী মন, বাংলাভাষা ও গদ্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি বহুবিধ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একেশ্বরবাদ ধর্মমতের প্রচারে ও প্রসারে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রাসঙ্গিক ভাষ্যসহ অনুবাদের প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন। এই সূত্রে অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে যে, রামমোহনই প্রথম বাংলা ভাষায় যথার্থ বেদান্তের ভাষ্য-প্রবক্তা। এই কাজের প্রারম্ভেই তিনি 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে একেশ্বরবাদী বিশ্বাসবোধের আরাধনাচক্র রচনা করেন। তিনি এই উপাসনালয়কেই প্রায় করে তুলেছিলেন একেশ্বর মতবাদের পথ প্রদর্শনের চিন্তায়। যেখানে সর্বধর্মের মানুষের সমাবেশ গঠিত হয়ে উঠেছিল ১৮১৫ খৃস্টাব্দের কালেই। এবং এরই এক পরবর্তী পদক্ষেপে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামকরণ হয় ১৮২৮ খৃস্টাব্দে যার রূপায়ণে সচেষ্ট হয় তাঁর পরবর্তী ভক্তবৃন্দ। তবে তাঁর প্রচেষ্টার মৌল বিন্দুতে প্রকাশিত বক্তব্য—'হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট'। এবং মতবাদের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট প্রবচনাবলীই তৎকালীন সমাজ-মানসে উপস্থাপিত করেন পুস্তিকায় বিতরণ করে। আর ব্যক্তি রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এক উদার উন্নত মানসিকতার বিদগ্ধ বিধান বিশিষ্টতায় অধিষ্ঠিত কলকাতা তথা বঙ্গীয় নাগরিকবৃন্দও বেশ কিছু তাঁকে কেন্দ্র করে সমাদৃত মানসে সমাজভুক্ত হয়ে ওঠে। এই ভাবেই বঙ্গের নাগরিকতার জীবনেও রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্মমতবাদের বাতাবরণ সৃষ্টি তাঁর জীবৎ কালেই হতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতেই তা হয় বহুল প্রচারিত বিজ্ঞজনের প্রাজ্ঞতার পরিচায়িকা। বা প্রজ্ঞান এক জনজাগৃতি।

এ যেমন সত্যি, তেমনি আবার সনাতনপন্থী হিন্দুসংস্কারাজ্ঞজনের দল রামমোহন বিরোধের কুচক্রও রচনা করতে থাকে। তারা নানান রকম রটনা করে ঘটনাকে বিকৃত করে। সত্যি-মিথ্যের প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে রক্ষণশীলতার মুখোশের হিন্দুসমাজ-মানস। তবে এই বিরুদ্ধবাদিতা ও বিদ্বেষ শুধু হিন্দুর কিছু-কিছু সম্প্রদায়েই সীমিত থাকে নি, খৃস্টধর্মের পাদরী পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে। কারণ তিনি 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' মূল পাঠের জন্যে হিব্রু ভাষাচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে তার আদত বক্তব্য গ্রহণীয় বলে যা অপপ্রচার খৃস্টধর্মাবলম্বীরা করে তাকে প্রকাশ করে দেন। 'নিউ টেস্টামেন্ট'

পড়ে নেন। তাই তিনি বাইবেলের মধ্যে প্রবেশ করে বলতে পেরেছিলেন যে খৃস্টের উপদেশাবলীই উপযুক্ত শিক্ষা, অবতারবাদ বা অলৌকিক গল্পকথা গ্রহণীয় নয়। তিনতত্ব নিয়ে তো তাঁর উপভোগ্য মজার রচনাও পাওয়া যায়। আর এই বাদানুবাদ সম্বলিত বহু বিস্তৃত বাকবিতণ্ডার চালু হয় পুস্তিকাকারে। তবে সব থেকে ভালোলাগার কথা, তাঁর ব্যক্তিত্বের ও যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধিতে রামমোহন-দলেই থাকতেন পাদরী উইলিয়াম অ্যাডাম। এবং রামমোহন ১৮২৮ খৃস্টাব্দের বিশে আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মসমাজ' যেখানে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-ইহুদী প্রভৃতি নানান ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষই তো জমায়েৎ হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীত উচ্চাংগের সুরে-তালে পরিবেশিত হয়েছে আর বেদ-উপনিষদ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ একদিকে একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মোপাসনা অন্যদিকে সর্বধর্মের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রপাঠ ও ব্রহ্মসংগীতিকে উপস্থাপনা। এক কথায় রামমোহন 'আত্মীয় সভা' থেকে 'ব্রাহ্মসমাজ' সংগঠিত করে ভারতীয় ধর্মসাধনাকে বিশ্ববাসীর প্রেক্ষিতেই উপস্থাপিত করেছিলেন।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্যই। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তার নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণসেবধি' যা ১৮২১ খৃস্টাব্দের প্রথম প্রকাশ ও ঐসালেই শুধু বাংলাপত্র 'সম্বাদ কৌমুদি' প্রকাশ হতে সুরু হয়। এবং ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবার' প্রথম প্রকাশ পায় পরের বছরই। তবে সব থেকে যা উল্লেখের তা হলো এই যে তাঁর 'সম্বাদ কৌমুদি'তে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অভিজাত হিন্দু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা উৎসবের বা কোনো বিশেষ খবরাখবর যা প্রতিমা পূজকদের তাও প্রকাশিত হয়েছে দেখা যায়। আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণের প্রতিবাদে ফারসী ভাষার পত্রিকাটি অপ্রকাশ রাখেন।

তবে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের যে অবদান ও অধ্যবসায় তা তো ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই। তিনি চান ইংরেজি ভাষাশিক্ষা এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার দ্বার ভারতীয় ছাত্রের বিস্তার বাহন হোক। তাঁরই প্রচেষ্টায় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ১৮২৩ খৃস্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত ইংরেজি বিদ্যার অনুশীলনের অনুকূলে। এখানে এক বিষয়ে শুধু উল্লেখ করা চলে যে, দেশের একশ্রেণীর মানুষ রামমোহনের এই যে ইংরেজি শিক্ষার চর্চাকেন্দ্র করা এবং দেশের বিদ্যাশিক্ষার সহায়ক হওয়া তারও বিশেষ বিরুদ্ধ ভূমিকাই গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একদল রটনা করে যে, রামমোহন যে কার্যকরী সমিতির মধ্যে থাকবেন তাতে তাঁরা সংযুক্ত হবেন না। এমন অশোভন কথা রামমোহনের কানে পৌঁছতেই তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন তৎক্ষণাৎ। তিনি শিক্ষার প্রসারই চাইলেন।

এ সব যেমন স্মরণীয় তেমনি আবার রামমোহন বলতেই যে বিষয় স্মরণের বিষয় হয় তা হলো সহমরণ প্রথার বিলোপ সাধক পুরোধা পুরুষ রূপে। তিনি তো চাইতেন

এই বিলোপ আইনের চেয়ে বিবেকই জাগ্রত হয়ে সহমরণের মতন জঘন্য মনোভাবের অবসান হোক। কিন্তু তা কি হয়? মানুষ শক্তের ভক্ত। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে চৌঠা ডিসেম্বর তারিখে লর্ড বেন্টিক আইনের নির্দেশনামায় সতীদাহ প্রথা আইন বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিধিবদ্ধ করান। স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণের নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথাকে বিধি-বহির্ভূত হয় আইনের চোখে। রামমোহন শাস্ত্রীয় হিন্দুগ্রন্থের প্রমাণ দাখিল করেন সহমরণ শাস্ত্রীয় নয় বলেই। কোনো শাস্ত্রেই সহমরণের সতীদাহ প্রথার নির্দেশনামা ছিল না। এ সব স্বার্থপর কুচক্রী সামাজিকজনের পরবর্তীকালের কুকর্ম। রামমোহনের মননে নারীর জীবন যথার্থ প্রাণের সম্পদ তা দগ্ধদাহনের নয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় নারীর আত্মমর্যাদার আরো অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন নারীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মন্ত্র-উদ্গাতা প্রবক্তাই। নারীর মর্যাদাকে তিনি মূল্যবোধের সঙ্গে তুল্যমূল্য জ্ঞান করেছেন। নারীকে চেয়েছেন জীবন্ত মানবতায়।

আর সাধারণ জীবনের আইনের বিষয়েও নানা ভাবে সদুক্তি কর্ণামৃতই দান করে গেছেন সারাজীবন। উত্তরাধিকারী আইন-কানুনের ক্ষেত্রে অথবা বিচারে জুরী প্রথা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকাও অগ্রগণ্যই। তিনি সক্রিয় ভাবে এই সব আইন-সংক্রান্ত নতুন প্রণয়নের আন্দোলনকারীই হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে বৃটিশ রাজশক্তিও যুক্তিবাদী রামমোহনের মতকেই প্রকারান্তরে মান্য করেছেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদী রামমোহন ভারতীয় মানসে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতি নির্ভর। তিনিই সে যুগের এমন একজন ছিলেন যিনি দেশবিদেশের অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার পর্যন্ত রাজনীতি সচেতন ছিলেন—খবরাখবর রাখতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, অষ্ট্রীয় সৈন্যদল নেপলস্‌কে আবার দখল করেছে তখন লিখলেন সে দেশের বিপদকে আপন বিপদ জ্ঞান করছেন। ১৮২৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি খবর পান দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশ সকল স্পেনের শোষণ-মুক্ত হয়েছে। তিনি আনন্দের অভিব্যক্তিতে নিজের বসত বাড়িকে আলোক-সজ্জিত করান এবং সবান্ধবের এক ভোজের আয়োজন করেন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে বৈপ্লবিক এক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেন। বিদেশ যাত্রার কালে তিনি স্বাধীন দেশের জয়পতাকাকে আবেগ-আতিশয্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে থাকেন সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু পায়ে আঘাত লাগে এবং কষ্টবোধ করতে থাকেন দৈহিক ভাবে। যদিও মানসিক উৎফুল্লভাব ছিলই তাঁর কারণ তিনি আনন্দিত স্বাধীনদেশের স্বাধীনতার পতাকাকে দেখছেন উচ্চাকাশে সৎপৎ করে বাতাসে উড্ডীন।

এখানে বলার যে বিষয় তা হলো, রাজা রামমোহন রায় সেদিন দিল্লীর সম্রাটের দূত হিসেবে ইংলণ্ডের রাজ-সমীপে প্রেরিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি হৃদয়ের অধিরাজ—তিনি স্বাভাবিক স্বনামধন্য পুরুষ—রাজা রামমোহন রায় নাম। এবং যা শুধুই তো নামমাত্র নয়, প্রেরণার ও নবজাগৃতির উৎসস্থল। তাই রামমোহন রায় বৃটিশ দরবারে বৈদেশিক দূতবৃন্দের সমগোত্রীয় হয়ে বসার আসন

কাভই করেন নি, তিনি ভারতীয় শুধু কেন যে কোনো স্বাধীনতা প্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই মানসসিংহাসনের কেন্দ্রে রাজাই—তিনি রাজা রামমোহন রায়ই।

তিনি যেমন মানসিকতার দিক থেকে তেমনি মননশীলতার দিকেও ছিলেন প্রজ্ঞানপুরুষ। গ্রন্থরচয়িতা হিসেবে গ্রন্থ তাঁর তিরিশটির কাছাকাছিই। তাঁর একটি আত্মজীবনকথার ইংরেজি রচনা ছাড়া আটত্রিশটির ইংরেজি রচনাও বর্তমান। আর কিছু ভারতীয় শাস্ত্র অনুবাদ। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'কে বাংলাভাষার আদিকালের ব্যাকরণ প্রকাশ বলা চলে। তিনি সংগীতগুরু কালী মীর্জার তত্ত্বাবধানে উচ্চাংগ সংগীতশিক্ষা করতেন। আর শুধু কণ্ঠে সুরের উদগীরণ নয় নিজেই বাংলা গীতিকবিতায় নতুন অবদান রচনা করলেন। তাঁর রচিত গীতিকার কথায় ভক্তিগীতি সর্ববাদী স্বীকৃত সম্পদ। অনেক গুলিই ধ্রুপদাংগ। তাঁর এই সব গান কলকাতার সংগীত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় এবং এই গান ভক্তিহৃদয়েরই আর্তির প্রকাশে ও প্রচলনে তাঁরই নিজস্ব কৃতিত্ব।

সব থেকে বড় কথা যা তা হলো, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আপন স্বাতন্ত্র্যের সাধক চিত্তের স্বাধীনতা নবজাগ্রত চেতনার আলোকে জাতীয় জীবনের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের জন্যে রেখে গেছেন উন্নত হৃদয়ের উদার বিবেকবোধ এবং আধুনিক উজ্জ্বল অনুভূতির এক প্রদীপ্তির জ্যোতির্লোক।

কারণ তিনি যে প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় বিভূতির আলোকিত সত্তাই।

স্বদেশীয় মানসে রামমোহন

॥ এক ॥

বহু বিতর্কিত ব্যক্তিত্বেরই এক অভিধার পথটি অতিক্রম করেও রাজা রামমোহন রায় স্বদেশীয় মানসে সশ্রদ্ধার বিস্ময়ময় পুরুষ। ১৭৭২ বা ৭৪ সালের বাইশে মে জন্ম যে মানুষটির তাঁর চিন্তা ও চেতনায়, তাঁর কর্ম ও ধর্মে এমন কি ছিল যা দেশবিদেশের বহু মনীষীকেই আকর্ষণ করে? এমন কি ছিল যা আজও এই দ্বিশত বর্ষের অতিক্রান্তির পরের উৎসবভূমিতেও তাঁর স্মরণের ডালি সাজাতে উৎসাহিত করে?

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথিক রামমোহন' বলেছেন। ভারত-সাধনার মৌলকেন্দ্রে অবস্থান করেছেন রামমোহন কিন্তু সেইখানেই তিনি স্থাণু হয়ে থাকেন নি—তাঁর জীবন ও মনন সদা চলোর্মি। নতুন নতুন স্রোতে অবগাহন করেছেন—কিন্তু তা ভারত-ভাবধারারই, তা ভারত-ঐতিহ্যের ও ঐশ্বর্যেরই। সদ্যআগত বৃটিশ রাজ-শক্তির মাধ্যমে আমদানী করা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নবীন-আলোককে রাজা রামমোহন আত্মস্থ করতে বললেন দ্রুত জাগৃতির সোপান-রূপে। প্রাচীন ও নবীনের ভাব ও

ভাবনাকে একসূত্রে বেঁধে নিতে বললেন আত্মচেতনার জাগৃতির জন্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়—'রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।'

ভারতবর্ষের জীবনধারায় যখন নানা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা ক্রিয়াশীল সেই সময় রামমোহন এলেন পরিচ্ছন্ন মন ও পরিশীলিত অন্তর নিয়ে, এলেন জীবন ও কর্ম, মনন ও ধর্মকে একাত্ম করার উদ্দীপনা নিয়ে। বহু ভাব ও ভাবনার দ্বন্দ্বে বিক্ষত ভারতীয় মানসে তিনি দিলেন একের মন্ত্র। 'রামমোহন রায়-আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদঘাটিত করে দিলেন।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ—'ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা; মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্যলাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।' নবযুগে বৃহত্তের মধ্যে ভারতসাধনাকে প্রতিষ্ঠার চিন্তায় যে মনীষী জীবনের-প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়োজিত রাখেন তাঁকে প্রণাম—তাঁর নামের আগেও বলা যায় প্রাতঃস্মরণীয় অভিধাটিকেই।

॥ দুই ॥

রাধানগর গ্রামেরই একটি ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত বংশের সন্তান রামমোহন রায় জীবনের বহুবিচিত্র পথে-পথেই পরিক্রমা করেছেন। এই জীবনেরই সম্পর্কে এমন সব পরস্পর-বিরোধী বিষয় নিয়ে নানা সময়ে বহুবিধ বিতর্কও হয়েছে তবু সে সব বিতর্কিত বিষয়কে জীবনীকারদের যাচাই করার ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁর সামগ্রিক কর্মের উদ্দীপনাটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমরা গ্রহণ করতে পারি তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ চিত্রটিকে, কারণ, আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছি আজও তাকে নিয়েই গর্ব ও গৌরববোধ করতে পারি। তাঁর সতীদাহ-প্রথা নিবারণবিধির সমসাময়িক ভূমিকাটি কেমন ছিল বা শিক্ষাপ্রসারে তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল তার চুলচেরা বিচার এড়িয়ে বলেই এগিয়ে যাওয়া ভালো কারণ আরো নতুন কোনো ব্যাখ্যায়, আরো বৃহৎ কোনো মানসিকতার পরিমণ্ডলে রাজা রামমোহন রায়কে আমরা পেতে পারি কি-না দেখতে হবে। তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ মনীষার কথা সমসাময়িক বা তাঁর প্রায় নিকটকালের বহু জনের লেখায় প্রকাশিত তাঁদের বহু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যেই এ কথা প্রমাণিত রয়েছে।

রামমোহন রায় রচিত অছিপত্রে (ট্রাস্টডিড) বলা হয়েছে—'জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্তা, অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ভগবানই একমাত্র উপাস্য। যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে।' এই অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক মনভাব তাঁর ছিল। তিনি তন্ত্রশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্ম প্রভৃতির মূল গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন এবং তার বিচার করেন। এই সব সমন্বয়ে তাঁর উদার হৃদয়ে ব্রহ্মমতের রূপ-রেখা তাঁর চিন্তায় আসে এবং তিনি একান্ত ব্রহ্মধ্যানী ছিলেন। তিনি যে একেশ্বরবাদী পাশ্চাত্ত্য দেশীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন তাও সর্বজনস্বীকার্য।

তিনি ভাবসমৃদ্ধ বাংলায় গীতিকবিতা রচনা করলেন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদাঙ্গ সুরে। তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করলেন। তিনি বাংলা গদ্যে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করলেন। বাংলা গদ্যে বলিষ্ঠ বাদপ্রতিবাদ রচনা করলেন।—যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগেই তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা এবং তার সাফল্য ও দেখা যায়। তিনি বেদ-উপনিষদের প্রথম বাংলা অনুবাদকের সম্মানে ভূষিত এবং আরো অনেক শাস্ত্রেরও। তিনি বাঙালী তথা ভারতপথিক হয়েও—বিশ্ববোধেরই পরিচয় নানাভাবে দিতে থাকেন। কারণ বিশ্বপরিক্রমণশীল ছিলেন রামমোহন।

স্বাধীনতার প্রতি প্রীতির উচ্চস্থান রামমোহনের মনে কতখানি ছিল তা বোঝা যায় 'মিরাট-উল আকবর' পত্রিকায় আয়র্ল্যাণ্ডের বিপ্লবীদেরই সমর্থনে রচিত লেখাটিতে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁলেবাঁ কে এক পত্রে লেখেন পাসপোর্ট প্রথা তুলে দেওয়ার কথা এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠনের কথা। ইউ-এন-ও গঠনের বহু পূর্বে আন্তর্জাতিক সংহতির ভাবনা রামমোহনের মানসেই প্রথম উদিত দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের ঋষির উদাত্ত আহ্বান 'শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—বিশ্ববাসীকে অমৃতপুত্র বলে ডাক দেওয়ার সার্থকতা তিনিই নিজের জীবনধারায় প্রমাণ করলেন। নিজে যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের সমস্ত বিধি মেনেও সাগরবুকে যাত্রা করলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই।

রামমোহন একদিকে বিদেশের সঙ্গে সংযোগ করছেন আর একদিকে স্বদেশবাসীর জন্যে গ্রন্থ অনুবাদ করছেন। সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন। তিনিই প্রথম বাংলায় অন্যভাষা থেকে শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করে বহুল প্রচার করেন। তিনিই বললেন প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদায়ের আচারগুলিই হিন্দুধর্ম নয়, বেদ-উপনিষদ যে ব্রহ্ম ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছে তার মধ্যেই হিন্দুধর্মের মৌলভূমি-বিচরণস্থল, বিবরণীয় বিষয়। নারীকে ভোগ্য থেকে ভাগবতী-ধারায় নিয়ে এলেন তিনি। সমাজে নারীর মর্যাদা, কৃষকের মর্যাদা, সাধারণ মানুষের স্বাধীন মর্যাদাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর সেকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে সংগ্রামী ভূমিকা তা এ যুগেও অভাবনীয়। এক কথায় প্রগতিশীল চিন্তানায়ক রামমোহন।

আর তাই প্রগতিপন্থীই রামমোহন।

রামমোহন জীবন ও জীবিকার বিচিত্র পথপরিক্রমায় এক ও অদ্বিতীয় অধিরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে আছেন। তাঁর তো জীবনীর প্রথম পর্বে গৃহের অভ্যন্তরেই আবাল্যের এক অভাবনীয় একান্ত চিন্তার বিকাশ। এক থেকে অনেক জানার অভীপ্সায় ইচ্ছার বিস্তার। দেশ ও জাতির সব মন ও মননে যথার্থ মানবতার দৃষ্টিকোণকে উদ্ঘাটন করাই তাঁর চেতনসত্তার বৈশিষ্ট্য। তাঁর চৈতন্যোদয়ে সেইরূপই কাল থেকে কালান্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার প্রবাহ রামমোহন-চিন্তার মহৎ ফলশ্রুতিই।

আর এই উত্তরাধিকারীই ভারত-ভাবনায় রামমোহনের যথাযোগ্য স্বদেশীকতায় উত্তরণের পথে বিশ্বমানবতার কথাই।

রামমোহন সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকমের মত প্রকাশ করে থাকেন। সমস্ত কিছুকে যেন ছাঁপিযে যায যখন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসসন্তান বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—'সেই মহান হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটাই ভারতের সাহায্য কল্পে অর্পণ করেছিলেন।' তিনি ছিলেন ভারত-ভাবনায় সদানৈষ্ঠিকও।

রামমোহনের জীবন ও বাণীর মধ্যে, কর্ম ও ধর্মের মধ্যে ছিল সমন্বয়ী দর্শন। তাই তিনি হিন্দুর প্রথাসর্বস্ব আচারকে ধর্ম বলে মানতে পারেন নি। যদিও তিনি বংশের প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য আচার ও উপবীত ধারণ করেই থেকেছেন বিদেশে গিযেও তথাপি যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ তার বিষয়ে লেখনীধারণ বা বক্তব্য উপস্থাপনে কখনও তিনি পিছু হাঁটেন নি। নিজের কুলপ্রথা বজায় রেখেও তৎকালীন কুসংস্কারকে তিনি অন্ধমোহ বলে দেখিয়ে দিয়েছেন বারবার। পরবর্তী প্রজন্মে নবজাগৃতিই ছিল তাঁর প্রার্থিত। সেই নবজাগৃতির উত্তরাধিকারী উনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজ, যে সমাজ আমাদের সত্য কথা বলতে, সত্য পথে চলতে এবং সত্যের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকতে দীক্ষা দিয়েছিল। তাই উচ্চারিত রবীন্দ্র-রচনায়—'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।'

ভারতে যুক্তিবাদী চেতনায় রামমোহনই যে পথিকৃৎ তা সর্বজনস্বীকার্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় মানস-গঠনেও তিনিই অগ্রনাযক। আজ যে ভারতবর্ষে বহু দল ও মত, আজ যে ভারত-ভূখণ্ডে নবীন উৎসাহ তার পূর্বসূরি রামমোহন। যার পরিণতিরই স্তরে স্তরে আজকের এই অগ্রগতি।

॥ তিন ॥

বিশ্বভ্রাতৃত্বের একক অগ্রদূত, ভারতপথিক ও আধুনিক ভাবনার মহান প্রবক্তা ছিলেন রামমোহন। তাই তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর মাহেন্দ্রলগ্নে সাহিত্যিক-চিন্তাবিদরা 'সাহিত্যতীর্থ'এর আমন্ত্রণে গত ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে মিলিত হয়ে আসছেন তাঁর মানিক-তলার ১১৩ আপার সার্কুলার রোডের বাগান-ঘেরা বাড়িতে। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে

নবজাগৃতির পুরোধা পুরুষ বলে রাজা রামমোহনকে চিহ্নিত করি কিন্তু তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্যে কিছুই করছি না। অনুরূপ আক্ষেপ আমহার্স্ট স্ট্রীটের তাঁর প্রাসাদের সামনে অনুষ্ঠিত সভাতেও জননায়করা অভিমত প্রকাশ করলেন। রাজার জন্ম-গ্রামে রাধানগরেরও সভায় নানা আক্ষেপ করা হয়েছে অন্যান্য স্থানের সভার মতোই। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তখন সেই সব প্রস্তাবও প্রকাশিত হল। সেই প্রস্তাবগুলি ছিল এই যে,বর্তমানে উত্তর কলকাতার উপনগরপালের কর্মকেন্দ্রের কেবল প্রাচীন ভবনটিকে রামমোহনের স্মৃতিসংগ্রহশালারূপে চিহ্নিত করা। এবং এটিকে পুলিস-বিভাগের অধীনেই তাঁদের দ্রষ্টব্য সামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনশালা করা। এখানে উল্লেখ করা চলে যে স্বাধীনতা আন্দোলন কালের বহু স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের সংগ্রহে আছে। অনেক বিখ্যাত নাটকের পাণ্ডুলিপির কথাও অনেকেই জানেন যা লালবাজারে অন্ধকারে বাক্সবন্দী রয়েছে। আরও কত নথিপত্র রয়েছে যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করতে পারে।

আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা, তুলনামূলকভাষাতত্ত্ব বা অনুরূপ আরো কোনো কোনো বিভাগের কেন্দ্রভবন করা। রাধানগরকে দ্রষ্টব্যস্থলরূপে সুসজ্জিত করারও প্রস্তাব হয়।

কলকাতার ময়দান চত্বরে পূর্ণাবয়ব মূর্তি পথিকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ'এর আবক্ষ শ্বেতমর্মর মূর্তি সাহিত্যসেবীর শ্রদ্ধার, 'রামমোহন লাইব্রেরি'র বৃহৎ তৈলচিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের আর তাঁর বাৎসারিক জন্মদিনের উৎসবে 'সাহিত্যতীর্থ'এর সভায় পুষ্পাঞ্জলিতে ভূষিত আবক্ষ তৈলচিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলির যোগ্য স্থল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় তাঁর আদর্শের আর অভিজ্ঞানের একান্ত রূপায়ণ? কোথায় তাঁর জীবন ও জীবনীর আধুনিকায়নের প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে তাঁর আশ্চর্য রূপচিত্রের প্রতিষ্ঠা?

আমাদের জীবনচর্চার পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হোক রামমোহনের প্রতিমূর্তি।

এখন তাই প্রার্থিত, রামমোহনের নবজাগ্রত মানসিকতার উত্তরাধিকারী আমরা তাঁর দ্বিশত বর্ষের জন্মদিন অতিক্রম করে এসে যেন যথার্থ স্মৃতিরক্ষায় তৎপর হই। ভারত সরকার রামমোহনের দ্বিশত জন্মবর্ষের স্মরণে গ্রন্থ ক্রয় ও বিতরণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন যা প্রশংসনীয় কিন্তু স্থায়ী স্মৃতিরক্ষায় তাঁর তিনটি কেন্দ্রভূমির দিকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায় না? আমরা কি শুধুই রামমোহনের নবচেতনার আলোক নিয়ে প্রজ্ঞাপ্রদ্যোতিত হয়েই থাকবো, প্রাজ্ঞপুরুষের পূজাবেদী রচনা করতে পারবো না? আমরা কি ১৯৩২ সালে উচ্চারিত রবীন্দ্র-রচনার বাণী সার্থক করতে পারবো না, যেখানে তিনি বলছেন—

'হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।'

আলোকিত রচনাবলীর রামমোহন

॥ এক ॥

রাজা রামমোহন রায় রচনাকারও।

হ্যাঁ, তবে তাঁর রচনায় ভারত-আত্মার আবিষ্কার বা মানবসত্তার স্বকীয় উপলব্ধির সিংহদুয়ারে উপস্থিতির দ্বারোদ্ঘাটন।

এই দ্বারপথে অবলোকনে ভারত-ঐতিহ্যের অতীত-আত্মার ঐশ্বর্য-সন্ধান এবং আপন ভাবনার মহতী উত্তরাধিকার চিন্তায় উদ্দীপ্তির অনুপ্রেরণা। তাই সেই প্রেরণার আলোকে আলোকিত হওয়া নব ভারতের উনিশ শতকীয় মনীষী-মিছিল। এমনি স্বর্ণময় যুগের মৌলবিন্দুর সন্ধানী হতে গেলেই উপনীত হতে হবে রামমোহন-রচনাবলীর দ্বারপ্রান্তে।

তিনি জীবনের পবিত্রকর্মরূপে মূলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। দেখলেন আপন চিন্তার ও চেতনার চৈতন্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বাস, সেখানে জাগ্রত ভারত-ভাবধারার মূলীভূত এক 'প্রথম আদি তব শক্তি'র কথা। যা আমাদের অধিচৈতন্যকে সচেতনার অনুভূতিপ্রবণতায় প্রবলভাবেই অগ্রবর্তী করে। আর অগ্রণী করে তাঁর রচনার উজ্জ্বল আলোকে-আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠায়।

তবে এ কথা ভাবার বিষয় তাঁর সমকালের অবস্থানুগ প্রেক্ষাপটেই। যখন আমাদের জগৎ ও জীবনেব এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের গর্ভে নিমজ্জমান অবস্থা। আমরা আমাদের অতীতকে বিস্মৃত হয়ে শুধু সমকালের কূপমণ্ডুকতায় ও কুসংস্কারে আর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ছত্তিরিশ কোটি দেবতা ও অসংখ্য উপদেবতার অনুবর্তনে অনুবর্তিত হতে থাকি। আমাদের আপন ঘরের উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখাকে প্রজ্বলিত রাখার কথা স্মরণেই রাখি না।

কিন্তু সেই আপন ঘরেব উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখাকে প্রজ্বলিত করলেন রাজা রামমোহন রায়। তাই তাঁর বচনাবলীই আলোকিত অনুভবের অগ্রদূত। আমাদের মননশীলতার বীজরোপণ আগামীকালের মহীরুহেরই প্রজ্ঞা-প্রজ্বলনে। যা সমগ্র উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে স্বর্ণ-সম্ভাবনার প্রদীপ্তিতে শাশ্বতীর শতাব্দী। এবং এই স্বর্ণোজ্জ্বল শতাব্দীর সমুদ্ভাবণের প্রারম্ভিক প্রবক্তাই তো রাজা রামমোহন রায়।

আর এই পথের পথিক হতে প্রথম প্রাথমিক প্রজ্ঞানে তাঁর ভারত-বিদ্যার আদিলোকের শাস্ত্রবাণীর প্রচার ও প্রসারে সমকালীন জনজীবনের ভাষার মাধ্যমকে নির্বাচন করলেন। তিনি বাংলা আর ইংরেজি এবং হিন্দুস্থানী অনুবাদে 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশে অগ্রবর্তী নায়ক। সংস্কৃত পাঠের একান্ত ঘরোয়া থেকে বা অন্দর মহল থেকে বারমহলে সর্বসাধারণের পঠনপাঠনের সামগ্রীতেই তিনি উপস্থাপন করলেন সর্বপ্রথম বেদান্তকে।

এক সময় রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি' সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থাবলি-সম্পাদনার মন্তব্যে ৮০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়—'ইহার অন্ত

নাম ব্রহ্ম সূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্মসমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ এই দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচাবোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বেদান্ত বিষয়ে এই ঐতিহাসিকতার ধারাস্রোতে অবগাহন করিয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতার সূত্রসন্ধান করা হয়েছে। একটা ক্রমবিবর্তিত পথের বিবর্তনধারাকে উপস্থাপনার পরই আদত বক্তব্যে উপনীত সম্পাদকীয় বক্তব্যে। সেখানে লেখা হয়েছে—'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোকমান্য শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ।'

এই মৌলবক্তব্যকেই রামমোহন-চিন্তায় আমাদের কাছে ধ্রুব-ধ্যানের। তিনি বেদান্তানুবাদের সার্থক রূপায়ণে প্রতিষ্ঠার ভূমিসন্ধান পেলেন—'একমাত্র ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ'-রূপে। তাঁর একেশ্বরবাদী ভাব ও ভাবনার আনুকূল্য ও অনুশীলন বেদান্তের বনিয়াদে। এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয় যে, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'র ৮১২ পৃষ্ঠার উক্তিসূত্র—শঙ্কর-ভাষ্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ রাজা রামমোহন রায়ও করেছিলেন। আর বাংলা হরফে ছাপা 'শারীরক মীমাংসা' তার দুটি খণ্ডের সন্ধানই গবেষক দৃষ্টিতে একদিন ধরাও দিয়েছিল।

তাই রামমোহন রায়ের বাংলায় বেদান্ত-চিন্তায় প্রকাশনার প্রচেষ্টাকে সর্বতঃভাবেই সর্বাগ্রে আমাদের অভিনন্দনীয়। তিনি মূলকে স্থাপন করে মতকে প্রকাশের উপযোগী মনে করলেন। মতামত দিলেন প্রাচীন মতের নজিরকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য ভাবে আদরনীয় উপায়ে। উপেয়কেই তিনি উপভোগ্য করে উপাদেয় করিয়েছিলেন।

এবং এই কাজের মৌল-প্রেরণায় ছিল রামমোহনের মননশীল মনের যুক্তিবাদী মানসিকতা। কারণ তিনি স্নাত ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিচারবোধের যুক্তিশীলতার দীক্ষায়। তাঁর শিক্ষায় ছিল বিচারের দ্বারা কষ্টিপাথরের আঁচড়ে স্বর্ণোজ্জ্বল খাঁটি সোনার সূত্রসন্ধান। আসল প্রতিমায় আদত প্রকৃতির দর্শন।

সেই দর্শনের সুযোগই সেই দিনে রামমোহন রায় দিয়েছিলেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' অনুবাদসহ

প্রকাশ করে। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন। ভূমিকায় ওঁ তৎ সৎ বলে লিখেছেন—'বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।' এই ব্রহ্মবাদের কথাকে তিনি বেদান্তপাঠের শাস্ত্রীয় অনুপ্রবেশের মুখপাতেই উল্লেখ করলেন যথাযথভাবে।

তবে তাঁর এ কথা ওপরে বলা হয়েছে দেখা যায়, যেখানে বলছেন—'প্রথমত এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা কহ তিঁহো বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপগুণবিশিষ্ট উপাসনা আবশ্যক হয়।' রামমোহন উদাহরণ দিয়েছেন পিতার ধারা রক্ষায় পুত্রের আকার পূজক হওয়ায় মতানুসারিতার অনুরূপ। তিনি এখানেও যুক্তির আশ্রয়ে বিবেক-জাগৃতির সহায়ক হতেই তো চিন্তা রাখার পক্ষপাতী। তাই বলছেন—'কি যুক্তিতে অস্বীকার করা যায় আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাহার উপাসনা কোনমতে হইতে পারে না॥' রামমোহন-চিন্তার বিস্ময়বোধ তৎকালীন যুগধারণার অন্ধতমিস্রায়। কারণ বলেছেন পূর্বপুরুষ ও স্ববর্গের মতকে নির্বিচারে গ্রহণ করাকে পশুজাতীয় ধর্মই বলা যায়। তিনি মানুষের সৎ-অসৎ বিবেচনার প্রতি আস্থা রেখেই বলতে চাইলেন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কি করে—'ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে'। তাঁর অবাক প্রশ্ন। তিনি বিচলিত বোধ করেছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ বিচারেই।

আমরা তাঁর পিতৃকুলের আর মাতৃকুলের কৌলিক বৈষ্ণব ও শাক্ত ধারার ভিন্নমুখিতার কথাতো জানি। হয়তো তার কথা মনেও এসে থাকতে পারে। তিনি লিখেছেন—'এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয়'। অর্থাৎ পূর্বমতের ভিন্ন প্রকারের প্রগতিকে রামমোহন স্মরণ করিয়েছেন। তিনি ধ্রুবপদে পদচারণা করিয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে।

তিনি সাকার উপাসনার প্রচলন স্বীকার করে শাস্ত্রব্যাখ্যার মৌলবিন্দুকেই স্পর্শ করলেন যে, তা ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র—আর অন্য কথা যা যত বলা হোক-না কেন। ব্রহ্মেরই রূপকে আকারে মনন। কিন্তু অন্তরে অবস্থিতিতে একই ব্রহ্মের নিরাকার নিবাস। যা সাধারণের সহজসাধ্য নয়।

অথচ রাজা রামমোহন রায় সেই সহজ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যা তত্ত্বটা তো আর সহজসাধ্য নয়!

তবে সব থেকে আকর্ষণীয় উক্তি তাঁর রচনানুষ্ঠানের গৌরচন্দ্রিকাই বলা যায় এখানের একটি কথাকে। তিনি লিখেছেন—'বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ-কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।' এ তাঁর রচনাকারের রচনাকার্যের কৈফিয়ত

স্বরূপ কিম্বা সহজ আরজি। যার মৌল বক্তব্যে নিহিত আছে—'ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।' এই কথাই রামমোহনের কথা—ব্রহ্ম উপাস্য।

তিনি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শাস্ত্রপাঠের যুক্তিজাল বিস্তার করেন। পঞ্চম বেদ বলেই তো পরিচিত 'মহাভারত' তা যেমন সকলের পাঠ্য তেমনি বেদ-বেদান্তও। এই যে সর্বসাধারণের পাঠ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা সংস্কৃত মহান ও মহৎ শাস্ত্রকে তাও রামমোহনের অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণেরই ফল।

সেই উন্নত উদার সহৃদয়-হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট রামমোহন বলছেন—'বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন'। তিনি বললেন—'পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন'। যার ফলে ভারতবর্ষে বেদ-বেদান্তের প্রচারে-প্রসারে সার্থক হয়। কিন্তু কালের কুটিলগ্রাসে তা বিস্মৃত ও অবহেলিত অবস্থায় আসে। তাই রামমোহনের উপলব্ধি—'এ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।' এ কথা রামমোহন রায়ের একান্ত স্বীকৃতির কথা।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥' শব্দচয়ন করি ব্রহ্মসূত্রের আদি উক্তিরূপে। রামমোহনও আরম্ভে তারই উদ্ধৃতি দিলেন। ভাববিস্তৃতির ব্যাখ্যা প্রদানে বলছেন—'চিত্তশুদ্ধি হইলের পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে।'

আর এরপরই যা বললেন তাতে প্রকাশ্য উপলব্ধির কথা—'এই বিশ্বের জন্ম স্থিতিনাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি।' এবং ব্রহ্ম ও জগৎকে প্রাসঙ্গিক চিন্তায় রেখে লিখছেন—'ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়॥'

রামমোহন বেদান্ত-দর্শনে দার্শনিক প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত হয়ে এই 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' ব্যাখ্যায় যথার্থতা। তিনি লিখছেন—'ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন।' আনন্দময় বাচক ব্রহ্ম এবং আনন্দময় ব্রহ্মলোক—এ ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তায় রামমোহনও। তাই বললেন—'আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন'। এবং 'আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন'। সেই হেতু ধর্তব্য—'ব্রহ্মই আনন্দময়'।

ব্রহ্ম বিশ্বাসী রামমোহন আনন্দতন্ময় এবং এইখানেই আনন্দবাদীও। কারণ তাঁর আনন্দই তো ব্রহ্ম মনোময়েই।

সেই আনন্দ-মনোময় হয়ে সদাচার জ্ঞানই রামমোহনের বিজ্ঞান। বিশেষরূপের এই তো জ্ঞান। এতো ব্রহ্মময় হয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানই।

এমনি অনুভূতির মধ্যে দিয়ে পাঠককে রাজা রামমোহন রায়ই বললেন—'মুক্ত জীব-

সকল এইরূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ এবং বৃদ্ধি হ্রাস হইতে রহিত হয়েন'। অর্থাৎ মুক্ত জীবের মুক্তির কথাই বলা হলো। রামমোহন এই মুক্ত মনের কথা মুক্ত করে গেলেন সর্বসাধারণের দরবারে। বনের ঋষির কুটির থেকে মনের মানুষের খোলা হাওয়ায় বইয়ে দিলেন। বেদান্তের সূত্র অজানার অন্ধকার থেকে আলোকের অবগাহনে অভিষিক্ত হলো।

বেদান্ত হলো বেদনার্ত মানুষের মুক্তির মন্ত্রগাথা।

কিম্বা আনন্দজীবনের ধ্যানমন্ত্র, জ্ঞানসূত্র এবং জাগ্রত ভাব হয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন ক্রিয়া। যার ব্যাখ্যায় রামমোহন বললেন—'প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের 'দ্বারা হয় না সেইরূপ মুক্তদিগের প্রকাশরূপে সর্ব্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় ঈশ্বরের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয়'। রামমোহনের বেদ-বিভূতির দীপান্বিত'ই ব্রহ্মগীতিকা।

মুক্ত মনের মধ্যে 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' কিম্বা 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে' কথাকলির এ আরেক অভিব্যক্তি, এ আরেক চিত্তে ব্রহ্মসূত্রে বেদান্ত-দর্শন।

আজকে সারবস্তুর সন্ধান সর্বক্ষেত্রেই। কৃষকের জমির সার সরকারী বা বেসরকারী যে ক্ষেত্র থেকেই আসুক তা প্রয়োজনীয়। মনের জমিনকে উর্বর ফসলোপযোগী করতেও আবাদের জন্যে সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। সারবস্তুই সময়োপযোগী। রামমোহন সেই প্রচলিত পথকে তাঁর ভারত-ভাবনায় জাতীয় জীবনে যথার্থ ঐতিহ্যধারায় অবগাহন করাতে এমনি সারের কথাই চিন্তা করেছিলেন। তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করার পরই চিন্তায় আনলেন জনসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য সময়-সংক্ষেপে উপলব্ধির বেদান্তের শিক্ষার আবশ্যকতা। তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থী উভয়কেই তুল্যমূল্য স্থান করে মৌলবস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। তারই সার্থক ফসল 'বেদান্তসার' সংকলন প্রকাশ। এখানে একই সঙ্গে গুরুবিষয়ের ভাববস্তুকে নিয়ে লঘু মনের পাঠকেরও কথা চিন্তায় রেখে আবশ্যকীয় বস্তু অবশ্য-অবশ্যই এক মন থেকে অন্য মনে সহজ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রামমোহন 'বেদান্তসার' বাংলায় যেমন রচনা করলেন তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে করলেন ইংরাজি ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও।

রামমোহন লিখছেন—'সমুদায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে' বলে মনে করছেন। এবং তাই যথাযথ অভিব্যক্ত করলেন এই বলেই—'চক্ষুর দ্বারা কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ হয়েন তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম কাহার দৃষ্ট নহেন অথচ সকলকে দেখেন শ্রুত নহেন অথচ সকল শুনেন। ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। বাক্য আর মনের অগোচর হয়েন। শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন॥' যার সহজ কথা অনেক দিনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না।

অর্থাৎ রামমোহনও বেদান্তসার সূত্রের অনুধাবনে প্রথম পাদেই উচ্চারণ করলেন ব্রহ্মের অভাবিত ও অকল্পনীয় অবস্থিতিরই এক অবাঙ্‌ মানসগোচর অচিন্তিত অনুভবের

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদের—'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে!' যেমন এক কথা। আবার তেমনি রামমোহনের বেদান্তসারের কথায়—'আত্মাতে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি আছে।...বস্তুত পরমাত্মা অচিন্ত্যণীয় সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন॥' অন্তর সম্পদের মধ্যে আত্মার আনন্দসিদ্ধিই এখানে। এবং বলা যায় রামমোহন সেই বেদান্তসারকেই আমাদের কাছে তুলে দিয়েছেন যার সন্ধানে জাগতিক চৈতন্যমাত্র চেতনপ্রাপ্ত হয়ে আত্মস্থ হবে।

তবে কিন্তু ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতাটিও রামমোহন-দৃষ্টিতে আকর্ষিত হয়েছে। তিনি বামদেব প্রসঙ্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তাকে উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞান করেছেন। বলছেন—'বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্মরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন।' অর্থাৎ অর্থ হয় সেই আমি কিম্বা আমিই সেই। এখানে আমি আত্মার পরমাত্মার আশ্রয় লাভ অথবা আমি আত্মার পরমাত্মায় অবস্থিতি।

অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি'। যেখানে রামমোহনের স্বীকৃতিও—'সেই পরমাত্মা তুমি হও।' বা উল্লেখ রেখেছেন—'তুমি হে ভগবান আমি হই।'

এতো একেবারেই আদিতে উপনীতির কথা। যে কথায় সৃষ্টিই চাইছে স্রষ্টায় অন্তর্লীন হয়ে যেতে। যা সাধকের, যা সাধনার। রামমোহন তবে কি সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলছেন?

অবশ্যই মনে হয় সে কথাই।

রামমোহন চেয়েছিলেন—একের কাছে একান্ত হতে।

এই একান্ত হওয়াই একেশ্বরবাদীর কথা নিশ্চয়ই রামমোহনেব।

আমরা একেশ্বরকে মনে নিয়ে মেনে চলি একান্ত হয়ে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ভাঙাগড়া, অনেক সংশয় ও সংঘাত। অনেক সংযোগ বিয়োগেব পথ মেনে নিয়ে পথযাত্রা পথিক হয়ে। 'পথেব সাথী, নমি বারম্বার'—বলেও 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'—কথাটা একটা যে তা গ্রহণ করতে পারি তাতে সন্দেহের কিছু নেই। তবে একজনকে প্রধান ভাবা যায়। এবং সেই প্রধানের মতন হতে পারার কথা ভাবা যায়। সেই কথাই আমাদের শাশ্বত ভারতাত্মার বাণী, সেই কথাই আমাদের ঐতিহ্যধারায় ভারত-ভাবনার ঐশ্বর্য। রামমোহন সেই বাণীবিভূতিকে বিস্তৃত করলেন, বিকশিত করলেন।

তাঁর কথায় ভাস্বর—'আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই সাক্ষাৎ শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই। সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই।' রামমোহনেরই মনে ধরা কথা এটি। তাই তিনি প্রচলিত উদাহরণকেই এই তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল করছেন—'ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার হয় এবং উপাদানকারণ হয়েন যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদানকারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায় আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের

উপাদানকারণ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার ঘটাকারে প্রত্যক্ষ হয়।' রামমোহন রায় এখানে যে এমনভাবে এমন কথার উল্লেখ রেখে যাবেন তাতে এ কথাই বিশ্বাসের বস্তু হয়ে যায় যখন আমরা ভাবতে পারি এই ভাবনার জগতে রামমোহনের অবগাহনের কথা। তিনি ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বালোকে চৈতন্যময় ছিলেন এবং তারই প্রভাবে প্রভাবিত সমগ্র প্রচার ও প্রকাশ মাধ্যম তাঁর।

রামমোহন তাই ভারত-ভাবনারই ভাস্বরমূর্তি।

তিনি যা চিন্তা করতেন, তিনি যা চিন্তা করাতেন এবং তিনি যে চিন্তায় চিন্তামণির পথ দেখাতেন তা তো সামগ্রিক ভাবেই ভারত-ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যময়।

তাঁর এই ভাবনার জগৎ কেমন ছিল?

এ প্রশ্ন স্বভাবত উৎপন্ন হয়। এবং রামমোহনের বেদান্তচিন্তার জগৎকে উপলব্ধি করতে হলে এ কথা অবশ্য-অবশ্যই আমাদের ভাবনার দিগন্তে উপলব্ধি করতে হয়। তিনি বলেছেন—'ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ হয়েন যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব এই শ্রুতিসকলের অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ হয়েন।' রামমোহন আমাদের প্রচলিত কার্যকারণ সম্পর্কের কথা চিন্তায় রেখেই এতটা দীর্ঘ বাক্যরচনা করে গেছেন। আমরাও তাঁর মনোদর্শনের প্রতিমা সন্ধানে সমর্থ হচ্ছি। আমাদের কাছে রামমোহন-জীবনদর্শনের চিত্রিত রূপায়ণ চঞ্চলিত হয়েছে।

বলা হয়েছে—'ব্রহ্ম চাহিলেন আমি অনেক হই।' বহুত্বের আশার কথা, এক থেকে বহু হওয়ার কথা। এই কথারই বিস্তৃতির ভাবনায় বলার বিষয় রামমোহনেরও—'ব্রহ্ম আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায় সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয় বস্তুত সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়।' সেই সত্যপ্রকাশকে রামমোহনও কি ভাবলেন?

তিনি ভাবছেন সত্যস্বরূপকে। তাই তাঁর জিজ্ঞাসায় জীবন্ত উক্তি—'নাম আর রূপ যাহা দেখহ সে সকল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের কোনো মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না॥' এই যে নাম আর নামীর, রূপ আর অরূপের, সীমা আর অসীমের, ধরা আর অধরার কথা বলা, এখানেই এক সত্যের ভিত্তির ভূমিতে অবস্থিতিকে উপলব্ধির কথা। একই এবং এক থেকেই যত বহু। রবীন্দ্র-সংগীতের এই—'সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'। কারণ নামরূপের অতীত ব্রহ্মকেই শাশ্বত উপলব্ধির।

তবে ছত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে রামমোহনের এই বেদান্তসার সমন্বয় মধ্যে দুই

দেবতার কথার শুধু উল্লেখই রোমাঞ্চিত করে। তিনি অনুবাদ-সহায়ে কৃষ্ণ এবং মহাদেব প্রসঙ্গ উহ্য রাখেন নি। তিনি তো বেশ প্রকাশ্যেই লিখছেন—'কৃষ্ণই পরম দেবতা হয়েন তাঁহার ধ্যান করিবেক।' আর লিখছেন—'মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি।' এবং উদ্ধৃত হয়েছে এই উক্তি—'আদিত্যকে উপাসনা করি।' সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এও—'পুনর্ব্বার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম।' সমুদ্রের অধিপতি দেবতা বরুণ। এই বারুণ শব্দের প্রচলনে স্ত্রীলিঙ্গের বরুণানীর বিশেষ প্রয়োগের কথা হয় তো হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর জলের দেবদেবীর কথাও স্থলভাগে থেকেও তো আমাদের করা হয়েছে। আমরা বারুণ উপাসনার কথা পাচ্ছি।

রামমোহন এ সব বলার কথা বলেও বলছেন—'সেই আয়ু আর অমৃতস্বরূপ আমাকে উপাসনা কর।' অনন্ত একেকে একান্ত আরাধনার কথাই তো আদতে অর্চনার আকৃতিতে। রামমোহন সেই ঐকান্তিক ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

এই ঐকান্তিক আর্তি নিয়ে রামমোহন চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই অন্তরের অগ্রগতি।

আমাদের আত্মদীপকে প্রজ্বলনের কথাও এখানে হয়তো বৌদ্ধদেবীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য মহৎ ভাবনারাজির মতন।

তিনি অনুবাদে উল্লেখ রেখেছেন—'মন ব্রহ্ম হয়েন তাঁহার উপাসনা করিবেক।'

এইখানেই আপন মনের মাধুরী দিয়ে উপাচার রচনার কথা। এইখানেই দেখা রামমোহনের যুক্তিশীল চিন্তানায়কের যে মননমার্গ সেখানেই মনকে প্রতিষ্ঠার ভূমিতে প্রতিমারূপ দেওয়া। মনকে মনে গ্রহণ করা। এবং তাঁকে যথার্থই অর্চনায় চর্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মন তো বন্দনীয়।

তবু এ কথা কেন?

প্রশ্ন জাগতে পারে। এবং জাগাটাই সহজ কথা।

মন তো আছে মনেই। সব কিছু করছে এবং করাচ্ছে।

এই যে কিছু করছে এবং করাচ্ছে—তাকেই উপচার দিয়ে উপাসনার কথা এসে যায়। অর্ঘ্য প্রদানের কথা এসে যায়।

রামমোহন অনুবাদ দিয়েছেন—'এই যে আত্মা কেবল তাহার উপাসনা করিবেক কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান লোকের কর্ত্তব্য না হয়॥' আর এমনি ভাবনার বিস্তৃতিতে জানা যাচ্ছে—'মানুষের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।' এ এক আরেক কথার অবতারণা, আরেক অবস্থার পর্যালোচনা। মন বৈরাগ্য বিভূতিতেই দৈবী হয় বললে এক ধরণের কথা হয়। কিন্তু এখানে বলা হলো বাদরায়ণের বক্তব্যকে পশ্চাৎপটে রেখে—বৈরাগ্য মানুষ ও দেবতার উভয়েরই ভূষণ। অবশ্য মনে আসতে পারে রবীন্দ্র-কবিতাকলির—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়!' সে আরেক প্রসঙ্গ, আরেক মানসিকতার কথা।

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের কথাকে মনে রেখেই অগ্রসর হয়েগেলে পাওয়া যায় কিছু আরো কথা। রামমোহনের অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত অংশই বলছে—'দেবতাদের মধ্যে ঋষিদের মধ্যে মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতার পূজ্য হয়েন'। আর বলছেন—'সকল দেবতা ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্টের পূজা করেন।' রামমোহন এখানে ব্রহ্মপূজারীর কথাও এনে দিয়েছেন বা পেয়েছেন সে কথাও।

সেখান থেকে রামমোহন তিনটে জিনিস পেয়েছিলেন কি-কি তাও বলছেন। তিনি বলছেন—'আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবেক ॥' এই ভাবধারাকে যথাযথ গ্রহণযোগ্য জ্ঞানে বলছেন—'ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায় হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাতীয় বিধি হয় অতএব শ্রবণ মননাদি অবশ্য জ্ঞানীর কর্ত্তব্য তৃতীয় বিধি অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতীয় অগ্ন্যাধান বিধি হয় পৃথক নহে।' এমন কথাকেও বলা হয়েছে। এমনি পালনীয় কাজ ভাবা হয়েছিল। এই যে তিন পর্যয়ভুক্তির কথা, একেও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হয়েছে। বলা হয়েছে—'ব্রহ্মের শ্রবণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ কর্ত্তব্য হয়। মনন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা পশ্চাৎ অভ্যাস দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক ॥' এখানে ব্রহ্মরূপের কথা আবার উপলব্ধির কথাও।

মোক্ষ মুক্তি বা নির্বাণের কথা বহুপ্রচলিত। রামমোহন প্রদত্ত অনুবাদে তার আরেক রূপ। এখানেই বলা হয়—'মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবেক না।' প্রকাশ্যে বলা হলো উপাসনায় উপনীত হতে হবে সর্বাবস্থায়। উপাসনাই উৎসমূল।

আর প্রয়োজনীয় জীবনচর্যায় একটি কথা, তা হলো—'মনের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকিবেক না বরঞ্চ মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবেক।' হয় তো মনে আসবে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা—'রসে-বশে রাখিস মা শুকনো সন্ন্যাসী করিস না।' এই বশে থাকা এবং বশে রাখার কথাই আসল।

রামমোহন-গ্রহণীয় ব্রহ্মোপাসনা মুক্তি ফল দাতা বা আত্মবিদ্যায় পুরুষার্থ সিদ্ধি প্রভৃতি ভাবনায় থাকে। কারণ 'ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষিত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে ব্রহ্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট সে ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥' এখানেই শেষ নয়। যা আরো বলা হয়েছে, তাতে পাওয়া যাচ্ছে—'ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্কল্পমাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন,' ব্রহ্মজ্ঞানীকে দেবতারা পূজা করেন, পুনর্জন্ম কখনও না, উত্তম গৃহস্থের অধিকার কর্মে ও সমাধিতে—এ সব কারণে শ্রবণ মনন ধ্যান অবশ্য করণীয় বা বেদে বলার ইঙ্গিত দিয়ে রামমোহন-উদ্ধৃত বক্তব্য।

সেখানে ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে চিত্তশুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানাচারে সর্বকর্মে নিযুক্ত থাকা। তীর্থের স্থান শুধু কেন মনের প্রবৃত্তিতেই উপাসনার কথা বেদের। রামমোহন জানালেন—'জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন॥' আমাদের আনন্দ-আত্মার অনুসন্ধানই রামমোহন রায়ের ইঙ্গিত প্রদত্ত ভারত-পথ।

বেদ-বেদান্ত উপনিষদ-পুরাণ সব থেকেও সবার সারবস্তুতেই রামমোহন রায়ের এক এবং অদ্বিতীয়ের অনুধ্যান। তাঁর জীবন ও জীবনীর, তাঁর বাণী ও বীক্ষণের বিভূতিই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

রামমোহন জীবনের গভীরতর লোকের সন্ধানে প্রাচীন ভারতের ঋষিবাক্যই ঋদ্ধরূপে গ্রাহ্য হয়। তিনি পরবর্তী কালের কোনোরকম তাৎক্ষনিক প্রবক্তার প্রচারকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর কাছে মৌলবিন্দুর বিকাশ এবং বৈভব প্রার্থিত ঠিকই তবে তা মৌলিক মন্ত্রে, কোনো স্বার্থসিদ্ধ যৌগিকতন্ত্রে নয়। তিনি তন্ত্রের মান্যপ্রবর কিনা তা নিয়ে বিচার-বিতর্ক থাকুক কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মহান শাস্ত্রীসিদ্ধান্তে অনড ও অটল। এই অটল নিদর্শনের উপস্থাপনে রামমোহন অভ্রান্ত এবং যুক্তিনিষ্ঠ।

তবে রামমোহন রায়ের সমকালে যে ঝড তোলে তারও কারণ হয় এই 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'। কারণ দেখা যায় ১৮১৭ খৃস্টাব্দে একটা প্রকাশনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যেটির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত—'এন্ এপোলজি ফব্ দি প্রেসেণ্ট সিস্টেম অফ্ হিন্দু ওয়ার্সিপ্—রিটেন ইন্ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গয়েজ এণ্ড এ্যাকম্প্যানিড বাই এন্ ইংলিস ট্রান্স্লেসন'। আর মুদ্রকের নামে লেখা আছে—'ক্যালকাটা: প্রিণ্টেড বাই এ. জি. বালফোব, এট্ দি গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেস, নং ১, মিশন রো।' এবং বছর রূপে '১৮১৭'। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নাম, যাব গ্রন্থকাব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়। রামমোহনেব মৌল কেন্দ্রিক আলোচনাকেই প্রতিবাদেব কেন্দ্রভূমি করে কর্কশ ধ্বনি বলা যায়।

বামমোহন এই প্রতিপাদ্যকে অগ্রাহ্য না কবে অগ্রণী হয়েছিলেন পাল্টা প্রচাবে। তিনি সোচ্চারে অগ্রসর হলেন তর্কযুদ্ধে। রচনা করলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৭৬৫ শকেব পৌষ থেকে চৈত্রে আর ১৭৭৬ শকের বৈশাখে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' কে তির্যককোণে দেখলেন। তাই প্রত্যুত্তর পুস্তিকার বচনাকে নামকরণ করলেন—'ভট্টাচার্য্যেব সহিত বিচার'।

এ কথাব যৌক্তিকতার উপস্থাপনে 'ভূমিকা'য় রামমোহনের প্রথম কথাই স্মরণীয়। তিনি আরম্ভেব ছত্রেই লিখছেন—'মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্বসাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারনা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও এক প্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম।'

আমাদের কাছে রামমোহন উচ্চারিত দীর্ঘবাক্য চমকিতই করে। কারণ 'বেদান্ত-

চন্দ্রিকা'র বিষয়ে প্রতিবাদ রচনা করতে বসে প্রথম কথাই লিখলেন পুনরায় তাঁর এই প্রতিবাদেরও প্রতিবাদকে আহ্বান জানিয়ে। এ প্রায় সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুরূপ। এবং এ ধরণের বলিষ্ঠতায় রামমোহন যথেষ্টই মুন্সীয়ানায় তিনি বিশ্বাসী। এই আত্ম-বিশ্বাসই রামমোহনকে সযুক্তির প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি হয়ে ওঠেন একান্তই যুক্তিযুক্ত যুগনায়ক।

রামমোহন যে তাঁর সমকালে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কথা রচনার প্রচেষ্টায় তা অকপটেই প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।'

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তনে রামমোহনের মননশীলতার এ এক জলন্তপ্রায় উক্তি-উদ্ধৃতিই বলা চলে। তিনি সহজ মানুষের জন্যে প্রথম বাংলা গদ্যের রচনায় চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। আর ধাপে-ধাপে যুক্তি খণ্ডনের যথার্থ বাংলা গদ্যের রচনাকার—এ কথা তাঁর সমকালের বাংলা ভাষার দিকে বিচারবোধকে সজাগ রেখেই বিচার্য। যা বাংলাগদ্যের ক্রমবিবর্তনের আদি রূপই।

এই যুক্তির উপস্থাপনাও পরতে-পরতে বিন্যস্ত।

তিনি দ্বিতীয় ভ্রম প্রদর্শন করেছেন শ্লোকের সূত্রসন্ধানে।

আর তৃতীয় ত্রুটিকে মারাত্মক ভাবে অসত্যের অজুহাত উপস্থাপনা বলেছেন এবং ভীরুতার বশে প্রতিপাদ্য ব্যক্তিত্বকে অনামী রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

আর রামমোহনের এই ভূমিকার শেষ ছত্রও কত শ্লেষাত্মক তাও উচ্চার্য, তিনি লিখেছেন—'ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি॥'

এও তো এক রামমোহনীয় সবিনয় নিবেদনই। বিনীত মননের সৌজন্যেই সংবেদন।

রামমোহন যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিচার বুদ্ধির নীতিবদ্ধ। তিনি নিজেকে প্রণালীবদ্ধভাবে কথাকার হয়েছেন এই প্রতিবাদপত্রের রচনাকালে। স্তবকে-স্তবকে প্রতিটি ত্রুটিকে তিনি খণ্ডন করেছেন বিনয়-সৌজন্যের পরিশীলিত পদ্ধতিতে। যার ফলে তিনি লিখছেন—'আমাদের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই' আর বলেন—'যে সকল ব্যক্তি জগন্নাথদেব যাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া কহেন তাঁহার প্রতি রথাদি যাত্রাতে কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইলে নানাবিধ দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকেন সেই সকল যখন কোনো অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি ক্রোধ করিবেন তখন সেই মনুষ্যকে অত্যন্ত মন্দ কহা তাঁহাদের

বিচিত্র হয় অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম ॥' এই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বাক্য বিন্যাসে মহাবক্তব্য রামমোহনের বা রামমোহনীয় উক্তি। এই বচন বিশেষ রচন পদ্ধতিতে রামমোহনীয় আদল ধরা যাচ্ছে। সেই বাংলাগদ্যের আদিরূপের স্রষ্টা রামমোহন।

তিনি স্পষ্টাস্পষ্টিই অসত্য ও অমার্জিত উক্তিকে উপলক্ষ্য করে সত্যকে তুলে ধরেছিলেন। যা বলা হয় নি তাকে বলার মধ্যে গ্রহণীয় ধরাকে লজ্জার বিষয় ভাবিয়েছেন। আর সব থেকে বড় কথা বলছেন—'আমাদিগে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না এ কারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয় এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষসকল দেখিতে পাইতেছিলাম না ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইতেছিলেন উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয় ॥' এই গুরুবাক্যকে বলা যায় রামমোহনের নিজস্ব ভাষণ ভঙ্গিমার। তাঁর বক্তব্য তাঁরই বাচনিক সৌজন্যের।

তবে উপাসনায় সাকার থেকে নিরাকারের কথায় রামমোহন। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে এই যে রচনা বিচারমূলক এতে রামমোহন উপাসনায় সাকারকে ঔচিত্যের কোঠায় রাখতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিরাকার আশ্রয়ের অভিলাষী।

রামমোহন অম্লান বদনে বকধূর্ত অপবাদেরও খণ্ডন করেন এবং স্বার্থপরতায় শাস্ত্র-বাক্য বিকৃত করার কথাও সহজেই ফাঁস করে দিয়েছেন। আর শেষরেখা টেনেছেন এই প্রতিবাদপত্রের এই বলে—'হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত করাইবে না ওঁ তৎ সৎ। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ ॥ ১৩ জ্যৈষ্ঠস্য ॥'

ব্রহ্মবাদী রামমোহনের ব্রহ্মের প্রতিই সদাচার প্রার্থনা। সত্যবিচারের ঐকান্তিক এ একটুকুই আরজিনামা!

ঔপনিষদিক চিন্তায় রামমোহনকে উপলব্ধির দিগন্তে স্পর্শ করতে হলে আমাদের একবার সে যুগের জীবনে বাংলায় বিশেষ করে পাঁচটি উপনিষদের প্রকাশ বিষয়েই বিবেচ্য। আমরা পাচ্ছি 'কেনোপনিষৎ'কে তাঁরই প্রচারিত 'তলবকার উপনিষৎ' শিরোনামায়। যার প্রথম মুখেই তিনি লিখেছেন—'এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব কহিতেছেন অতএব এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদশিরোভাগ কহা যায়।' এই বেদ-উপক্রমণিকার মধ্যে রামমোহন বা রামমোহনের মধ্যেই এই উপনিষৎ। 'তলবকার উপনিষৎ' তিনি ১৮১৬ খৃস্টাব্দে জুন মাসের সময় প্রকাশ করেছেন জানা যায়। 'ঈশোপনিষৎ' ঐ সালেই জুলাই-এ, 'কঠোপনিষৎ' ১৮১৭ খৃস্টাব্দের আগস্টে, 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' এই সালেরই অক্টোবরে আর 'মুণ্ডকোপনিষৎ' সম্ভবতঃ ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ অনুমান করা হয়। অন্য চারটি উপনিষদের প্রকাশনায় যেমন তারিখ উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে এটিতে তার হদিস নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী' প্রথম

খণ্ডের প্রদত্ত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ২৭ মার্চের পুস্তক বিজ্ঞপ্তির কথা। সেখানে বলা হয়—'নূতন পুস্তক। শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।' প্রকাশকাল বিষয়টিকে এই পর্যন্ত জেনে আরো যা জানা যাচ্ছে তাও প্রামাণ্যপত্রই। দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে ছাপা মুদ্রিত গ্রন্থের বাংলা তালিকাতে পাদরি লঙ্‌ সাহেব উল্লেখ করেছেন 'মুণ্ডক উপনিষৎ, বাই আর. রায়, ১৮১৯' বলেই। হয় তো আরো কিছু এবং আরো কতই-না প্রমাণপঞ্জী রয়েছে কিম্বা হারিয়ে গিয়েছে! তবে রামমোহন ও উপনিষদ উপলব্ধির এতো অবশ্য-অবশ্যই।

রামমোহনের বাংলায় কথিকা হিসেবে আজ পঠনের বিষয় ভাবনায় আমার সচেষ্ট মন নিবে উল্লেখ করছি এই যে মুণ্ডকোপনিষৎ তারই শেষের দিকে একটি—'যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানিব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশ সেই সর্বত্র-ব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন।' রামমোহনের পরমচিন্তায় পরিবেশিত সমুদ্র-সলিলেরই বৃহৎবৃত্তে। তিনি নদীর গতিকে সমুদ্রমুখী মোহনায় উপনীত-রূপ অভিযাত্রীই। তাঁর চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বলতে পেরেছিলেন—'কোনো ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির বংশে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ও পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের কারণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।' এ রামমোহনের মুক্তমনের মহান বক্তব্যের যথার্থ উচ্চারণ। যা যথাযথ এবং যথোপযুক্ত জীবনচর্যায় ও মানসচর্চায় প্রতিফলিত রামমোহনেরই এক এবং একক সমগ্র জীবনায়নে।

ব্রহ্মবাদীই রামমোহন, বেদান্তবোধের রামমোহনই ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসন্ধানে ঔপনিষদিক রামমোহন। তাঁর তন্ত্রে-মন্ত্রে উপনিষদের উপলব্ধিই। তিনিই উপনিষদময়।

তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ'এর ভূমিকার উক্তিই এখানে উচ্চার্য. তিনি বলছেন—'যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না।' রামমোহন রায় উপনিষদ প্রথায় উপাসনা প্রবর। তাঁর উপলব্ধির উৎসে ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের শিক্ষাচত্বরে যে সব শিক্ষার্থী সমীপে শুভার্থীর নিবেদন রেখেছেন, তারই বক্তব্যে উপনিষদবাণীর মৌলকেন্দ্র বারবার অনুরণিত। তাকে বলা যায়, রামমোহনের পর মহর্ষীর পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে উপদেশমুখ্য জ্ঞান করলেন। তার মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অন্তরে অনুপ্রবেশ মনকে আকর্ষণ করবেও। তবে উপনিষদের উপনিবেশকে উপলক্ষ্য করার নবযুগের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ই। তাঁর নানা বক্তব্যেই তাই বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেও সেই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রবাণীই একান্ত আশ্রয়স্থল হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের

যথার্থ জীবনচর্যায় ভারত-সাধনার মৌলভিত্তিই গ্রহণীয়, পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত সংস্কার-রীতিকে নয়, কোনো অপব্যাখ্যাকে নয়।

॥ দুই ॥

'আত্মীয় সভা' নামে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের কথা বহু-উচ্চারিতই। এবং তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে, একত্র নানা মনের মানুষকে মজলিসীতে বসানো বাঙালী সমাজে এ এক অভিনব। ইংরেজের জাঁকজমকে গড়ে ওঠা শহর এ কলকাতা, যা সারা ইংরেজ ভারতের রাজধানী-শহর, সেখানে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীর ঢেউ খেলছে। আগের পার্শি, ইহুদী, ইসলামী তো আছেই। এই নানা ভাবের নানা ধর্মের মানুষের শহর, তখনই কলকাতা। সেই ধর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র চিন্তায় বৈঠকী-মন হয় রামমোহনের। তিনি ভাবেন এক বাসরেই আসর গরম করুক বিভিন্ন ধর্মের অনুব্রতীর মন। এবং সেই সম্মেলনে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধনীই আসল চিন্তনে। তাই রামমোহন সেদিন সমাবেশের নাম অন্য কোনো না নির্বাচন করেই একেই সওয়াল করেন —নামকরণ করেছিলেন 'আত্মীয় সভা'। আত্মীয় হয়েছেন সবাই—যারা বসছেন, আলাপ-আলোচনা করছেন সবাই-ই এক অন্তরের পুরুষ-প্রকৃতি, সবাই অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মিলেজুলে মানসিকতাকে উপলব্ধি করবে। রামমোহনের সেদিনের চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিমপণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা'।

রামমোহন চেয়েছিলেন 'আত্মীয় সভা' করে জীবনকে জীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত রাখতে আর জীবনযাত্রায় কৃত্রিমপণ্যের বোঝায় ভরপুর হয়ে ব্যর্থ না হতে। কারণ মিলনমেলায় তো গানের পশরার সম্পদ।

'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার প্রথমপর্ব ধরা হয় রামমোহনের কলকাতা বসতির কাল-সূচনাকেই। সেই হিসেবে ১৮১৪ খৃস্টাব্দ কিনা বলা যায় না তবে ১৮১৬ খৃস্টাব্দ থেকে 'আত্মীয় সভা'র বৈঠকী কথার হদিশ মেলে। এই সময়কালের রামমোহন-জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাব তিনি রংপুর থেকে কলকাতায় স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে এসেছেন ১৮১৪ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝিই। তবে ১৮১৫ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে ভুটান আর রংপুরকে কেন্দ্র করে দোটানায় কাটিয়েছেন। কারণ তিনি ইংরেজ সরকারী কিছু বিশেষ গোপন-দৌত্যের দায়িত্বে ছিলেন। ১৮১৫ খৃস্টাব্দেই 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেন কলকাতাতে আসার পরই এবং মনে করা হয় সেই সময়েই 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। যার বৈঠকগুলি বামমোহনের আপার সার্কুলার রোডের মাণিকতলায় বাগান ঘেরা বাড়ির মধ্যে বা কোনো-না-কোনো সভ্যের আহ্বানেও কখনো-সখনো তাঁদেরও বাড়িতে। সে যাই হোক, মৌলভূমি ধরতব্য রামমোহনের পুরোণো বসত-বাড়িকেই 'আত্মীয় সভা'র প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে। আর সেখানে একান্তভাবে শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলাপ-সালাপ যেমন চলতে থেকেছে তেমনই আবার ব্রহ্মসংগীতও হয়েছে যার গীতিকার স্বয়ং রামমোহনই। তাই 'আত্মীয় সভা'কেই আমাদের গীতিকার রামমোহনের প্রারম্ভ প্রকাশ।

ষণ বলেই উল্লেখ করা চলে এবং দেখা যায় আত্মীয়তাবোধের কথাই রামমোহনেরও 'আত্মীয় সভা'র সংগঠন কথারই প্রাণভোমরায়।

কিন্তু 'আত্মীয় সভা'কে সব থেকে উল্লেখের আরেকটি কারণ যা হয়, তা হলো এখানেই উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের প্রদত্ত সব প্রশ্নপত্র উপস্থিত হয়েছে এবং রামমোহন তার পাল্টাপাল্টি জবাব দিয়েছেন। সেগুলির মুদ্রাকর 'আত্মীয় সভার নির্বাহক' রূপে বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রশ্নোত্তর পর্ব ১৮১৬ খৃস্টাব্দের কথা। 'আত্মীয় সভা'র কার্যকালের আদিপর্বের অনুসঙ্গ। তাই রামমোহন-রচনায় বাক্‌বিতণ্ডার শাস্ত্র-উক্তির সহায়ে বিচারবিশ্লেষণকার্য প্রথম হয় 'আত্মীয় সভা'য়ই যে তারই তো প্রামাণিকপত্র 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার'। এই প্রশ্নোত্তর পর্বের চারটি মুদ্রিত প্রকাশনা পাওয়া গিয়েছে। যার হদিশ পাওয়া যায় শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির সংগ্রহে। সেগুলির প্রকাশকাল ২৪ জ্যৈষ্ঠ (১২২৩)/২৬ মে ১৮১৬, ১৯ আশ্বিন ১২২৩/৩ অক্টোবর ১৮১৬, ৩১ আশ্বিন ১২২৩/১৫ অক্টোবর ১৮১৬, ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৩/৩ ডিসেম্বর ১৮১৬। এবং এগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৭, ১৯, ১৬ ও ১০। যার ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলার। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থই রামমোহন দ্বারা জবাব। ১৮১৯-২০ সময় কালের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী 'কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি' প্রদত্ত পুস্তকে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট-ভুক্ত দেশীয় ছাপাখানা-মুদ্রিত গ্রন্থাবলী-তালিকায় সংস্কৃত প্রকাশের মধ্যে তিনটির উল্লেখ আছে। তার মধ্যে দুটিই রামমোহন রায়ের এবং একটি উৎসবানন্দ ভট্টাচার্যের উত্তররূপে উল্লেখ করা আছে। এখানে এইটুকু আরো বলা যায় যে, এই প্রাজ্ঞপুরুষ 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হলে উপনিষদের ব্যাখ্যা কারক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এবং সেই মানসিকতা নিশ্চয়ই রামমোহন তাঁর বক্তব্যের নিতান্ত সারবত্তার প্রভাবেই প্রভাবিত করেছিলেন সেদিনের এক পণ্ডিতজনকেও।

'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের সংখ্যায় রামমোহনের ৩১ আশ্বিন ১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রদত্ত উৎসবানন্দের প্রত্যুত্তরের উত্তরটি বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হয়। সেটির অনুবাদক নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। আরো আগের বিচারটির অনুবাদও হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। হয় নি বোধ হয়।

প্রথম বিচারের বাণী উত্থিত, যার সূচনার কথায় বলা হয়েছে—'এই প্রশ্ন ১৪ জ্যৈষ্ঠ (১২২৩) রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আত্মীয় সভাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকারের হস্তে পায়া গেল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রস্থাপিত।'

আর রামমোহন প্রদত্ত উত্তরের অন্তে ইতি বলার পর 'আত্মীয় সভা' উল্লেখ হয়েছে।

তাই দেখা যাচ্ছে যুক্তিবাদী রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারবিশ্লেষণের আঙিনায় অবতীর্ণ হওয়ার যেটিকে অবকাশ বলা চলে তার প্রথম পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে 'আত্মীয় সভা'তেই। তিনি 'আত্মীয় সভা'র আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞানভূমির বনিয়াদে। তাঁর বিচারের সংস্কৃত ভাষার বঙ্গানুবাদ থেকে তাই উদ্ধার করা যায়— 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী বিষ্ণু বৈকুণ্ঠনাথের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এই তিনের

সগুণত্ব এবং শারীরিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, যে সকল বস্তু দিক্‌, কাল ও আকাশের সহিত সম্বন্ধসম্পন্ন, মন প্রভৃতির জ্ঞেয়, তাহাদের সগুণতা এবং পরিচ্ছন্নতা যুক্তিসিদ্ধ।' রামমোহন এই প্রশংসনীয় উক্তির পরেই লিখলেন—'কিন্তু আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিনের একত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের মধ্যে এক বিষ্ণু সেব্য ও ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সেবক, এই যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা সমস্ত সদ্‌যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ইহা অভিমত নয়। ইহা আপনার কথিত বিষয়েরও প্রতিকূল। কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনই যদি এক হয়েন, তাহা হইলে দ্বিতীয় থাকেন না বলিয়া সেব্য সেবক ভাব অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষ একের সেব্যত্ব এবং অপর দুইটির সেবকত্ব বিষয়ে কোনও যুক্তি নাই। অপিচ সেবকত্ব এবং পরমেশ্বরত্ব, এই দুইটি ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উহা এক বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না (অথচ পূর্ব্বেই আপনি তিনকে এক বস্তু স্বীকার করিয়াছেন)।' রামমোহনের একেশ্বরবাদের চিন্তার যৌক্তিকতারই এও এক ক্রমবিকাশ বলা চলে।

তিনি বলছেন—'আপনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব সূচনা ও ব্রহ্ম এবং শিব হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও কেবল কষ্ঠসাধ্য ব্যুৎপত্তির সাহায্যে দশোপনিষদের যে যে শ্রুতিবাক্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শিবোপাকগণও শিবের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণু হইতে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সেইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন।' রামমোহন অনুরূপ আবার সূর্যোপাসক ও শাক্তগণের কথাও বলেন। আপন-আপন দৈবী শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপর দৈবী প্রাধান্য খাটো করার পক্ষপাতী তিনি নন। তাই বলেছেন—'ইহাদের মধ্যে একটি শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অপর শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করার বিষয়ে কোনও কারণ নাই।' রামমোহন উক্তি করে প্রামাণিক উদ্ধৃতিসহ স্বযুক্তিতেই আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে বিচার্যবিষয় একটিই যা সর্বাগ্রে স্বীকার্য তা হলো, রামমোহন ভারতীয় ধর্মের সর্বশাখায় বহুপঠিত পুরুষ ছিলেন যে তারই এক জাজ্বল্যমান প্রমাণপঞ্জী এই 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার'-সমূহ।

রামমোহন এখানে আবার দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথায় যুক্তিশীল মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর যুক্তি প্রদানে ভাষার নিদর্শন উচ্চার্য। তিনি লিখেছেন—'শাস্ত্রেই হউক অথবা ব্যবহারেই হউক, উপমানের সমস্ত ধর্ম্মের দ্বারা উপমা সম্ভব হয় না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এই কথা বলিলে মুখের দেবত্ব, আকাশস্থতা, কলঙ্কশালিতা, উভয় পক্ষে হ্রাসবৃদ্ধিযুক্তত্তা কখনও বুঝায় না।'

তবে ব্রহ্ম প্রসঙ্গের যা রামমোহনের প্রদত্ত বক্তব্য তাই তাঁর মানসিক অনুকূল। সেটিই এখান থেকেই যথোপযুক্ত আহরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন—'অদ্বৈত, সুখ, আনন্দ, বিজ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ। "জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনটি মায়া দ্বারা প্রকাশিত হয়। তিনটিকে বিচার করিলে এক আত্মাই অবশিষ্ট

থাকেন। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জ্ঞান, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জ্ঞেয় এবং স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা, ইহা যে জানে, সেই আত্মবিৎ।" ইত্যাদি বচনসমূহ, "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মোপাসনার জন্যই।' রামমোহনের ব্রহ্মোপলব্ধির এ এক একান্ত উক্তিই।

যিনি কাজ করেন তাঁরই কাজের বিষয়ে অকাজের দায় বহন করতে হয়, যিনিই কথা বলেন তাঁকেই কিছু-না-কিছু বিপরীত কথা শুনতে হয়। কাজের লোককে, কথার লোককে এর জন্যে প্রস্তুত থাকতেই হয়। রাজা রামমোহন রায় তারই-বা ব্যতিক্রম হবেন কেন? তাঁকেও প্রতিবাদ পত্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বারবার বিভিন্ন বিদগ্ধ জনসমাজের কাছ থেকেই। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ যেমন এর মধ্যে অন্যতম তেমনি আরো কেউ-কেউ। অনেকের অনুমান তাঁদের মধ্যে রামগোপাল শর্মণঃ তাঁদের মধ্যেই গণ্য হয়ে যান। এর প্রমাণ স্বরূপ 'কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি'র ১৮১৯-২০ খৃস্টাব্দের তৃতীয় বর্ষের বিবরণীর পরিশিষ্টের ছাপা বইয়ের তালিকায় বাংলা-বিভাগের মধ্যে এই রামমোহনেরই জবাবী হিসেবে যার উল্লেখ করা তাতে বলা হয়েছে রামগোপাল শর্মণের নাম। এই রামগোপাল শর্মণকেই ধরে নেওয়া হয়েছে প্রশ্নকর্তা 'গোস্বামী'। তাই ধরা হয় 'গোস্বামীর সহিত বিচার'টি রামমোহন প্রদত্ত রামগোপাল-দ্বারা জিজ্ঞাসিত হওয়ায়।

এই জিজ্ঞাসাপত্রের কথা রামমোহনই হদিশ দিয়েছেন—'ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন।' তাই রামমোহন উত্তর দশোপনিষদ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহযোগে দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় জবাব দিয়েছিলেন। এবং শেষে যার রামমোহন বলছেন—'এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থসাধন হয় আব কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়াস্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।' তিনি ইতির রেখা টেনেছেন যে তারিখের উল্লেখে তা হলো—২ আষাঢ় ১২২৫।

পুস্তিকাটির প্রকাশকাল জানা না গেলেও লেখার-কাল জানা যাচ্ছে।

আর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকার প্রকাশকাল ১৮২০ খৃস্টাব্দের ধরা হয়। কিন্তু 'কবিতাকার' ব্যক্তির পরিচয় অজানাই। ভূমিকার শেষে বছরের উল্লেখ থাকায় সেটিকেই প্রকাশ সময় অনুমিত। প্রথমে ভূমিকা অংশ তাব পর প্রত্যুত্তর। এই প্রত্যুত্তর শেষ করেছেন ১৭৪২ শকাব্দের উল্লেখে।

ভূমিকায় রামমোহন প্রথমেই অসংকোচে বলেছেন—'ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন'। এমনি বলার পরও রামমোহন আরো বলছেন—'এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল'। এবং এখানে তিনি আবার মহাভারতীয় একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতির পর সেই অর্থও বাংলানুবাদে দিয়েছেন

—'পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়।' তবে রামমোহন সুরসিক। তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—'কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই।'

রামমোহন বাংলাগদ্যের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আগের বাংলা রূপের কবিতাকারই অগ্রগণ্য না হলেও গণ্য। এটিকে সেইধারার স্রোতেই বিচার্য। রামমোহনের জবাবী বক্তব্য থেকে বোঝা যায় এও তাঁর বেদান্তদর্শনের আলোক-পাতেই সোচ্চার বিবৃতি। এবং রামমোহন ও ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয়ের অশালীন কথারও জবাবী আছে। কবিতাকার বলেছেন, আহারাদির সময় ব্রহ্মজ্ঞানী বা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে দরবারে যাওয়া। রামমোহন তাই শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বেদান্ত প্রসঙ্গের এবং জীবনযাত্রার বিষয়ে লৌকিক কথায় একে-একে নাকচ করেছেন কবিতাকারের কৌতুহল। রামমোহন ভূমিকা অংশের শেষ ছত্রে প্রার্থনা করেছেন—'হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাঁহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই'।

কবিতাকারের প্রত্যুত্তরের প্রায় শেষের ভাগে রামমোহন উচ্চারণ করলেন—'এখন কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন।'

রামমোহন বেদান্তদর্শনের প্রবক্তা, তিনি পরমেশ্বরের প্রার্থিত পুরুষ এবং লৌকিক চেতনায় জাগ্রত। তাঁর এই জাগৃতিচৈতন্যের আরেকটি প্রমাণপত্র 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'। যদিও অল্প কথিকায়। এই বিচারবিশ্লেষণের রামমোহনীয় বক্তব্যে ব্রহ্মবাদের কথার মধ্যে এও বলা হয়েছে—'ঈশ্বর গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন'। এবং তিনি আত্মতত্ত্বের শ্রবণ-মননাদির চর্চায় চর্চিত থাকার কথা ভেবেছেন। তাঁর পরম প্রজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যায় অবস্থিতি।

রামমোহন যুক্তিশীল ব্যক্তিত্বের সুভদ্র প্রজ্ঞানী।

তিনি ভারতীয় শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশকে উদ্ধৃতি দিয়ে উদ্ধার করেছেন উদ্বোধিত হবার বিষয়কেই। তাঁর প্রজ্ঞা বেদান্তদর্শনে, তিনি উপনিষদের সমৃদ্ধ-বাণীর আধুনিক প্রবক্তা। তাঁকে অনুবাদ প্রকাশে এবং বিচারকার্যে উপনিষদের আধুনিক সভ্যতার বাতাবরণেও উপযোগিতার প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবাহে প্রাচ্য-বেদান্তের প্রতি যথার্থ ই আলোকপাত করেছেন। তিনি স্বদেশের বুকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের আলোক-দিশারী।

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের ভাষণমালায় ঔপনিষদিক মননশীল ব্যাখ্যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যুগোপযোগী কথাকার। রামমোহন সংস্কৃত থেকে অনুবাদে মূলসহ প্রকাশ আর প্রত্যুত্তরের বিচারবিশ্লেষণে আদতের প্রচারই করেছিলেন। তাই তাঁর প্রার্থিত—'হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে দ্বেষ হইতে বিরত কর।' এই দ্বেষহীন শিষ্টতাই রামমোহনের মনন। রামমোহন সুভদ্র সৌজন্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

আমরা রবীন্দ্র-মননে পাই এই মার্জিত মানসিকতা।

'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের 'শুচি' অংশে বলেছেন—'আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়েই থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই ; তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে। তাই স্বার্থের জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে—এই গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন—তিনি আমাদের বাঁচান।' এখানেও প্রার্থনা। যদিও রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বলেছিলেন—'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।' তবুও সমষ্টির কল্যাণকামনায় সার্বজনীন হিতাকাঙ্ক্ষায়।

এই সার্বজনীন মঙ্গলবোধ নিয়ে রামমোহনের থেকে রবীন্দ্রনাথে উপনীত হয়েও প্রার্থনা, ঔপনিষদিক বাণীবিধৃতির অনুরণনের প্রার্থনা। 'পিতার বোধ' অংশে বলছেন—'প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি: পিতা নো বোধি। কিন্তু, একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি ; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে।' আমাদের রবীন্দ্রনাথের এ কথা। কিন্তু রামমোহনেরও এক ও অদ্বিতীয়ের ধ্যানে বড়ো সাধনাই জীবন-উপাসনা। কারণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। উপনিষদের উপাসনাই রামমোহন থেকে আধুনিক ধারায় প্রবহমান।

রবীন্দ্রনাথ তাই 'সত্য হওয়া' অংশে বললেন—'ব্রহ্মকে সহজ করে জানার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি ; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে পারছি নে বলে সে শক্তি-কে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে—বারবার তাঁকে বলতে হবে, 'এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখে, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে।'

রামমোহনের ব্রহ্ম-ধ্যানেরই এ উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-মননে। তাই বলতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ—'আমার চিত্ত বলবে 'সত্যং,' আমার বিশ্বচরাচর বলবে 'সত্যং'। ক্রমে আমার প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে 'সত্যং'।' এই সত্যধ্বনিত বিশ্বলোক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে। কারণ রবীন্দ্র-বোধে 'বর্ষশেষ' অংশে বলতে পারেন—'জীবন যতই এগচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মাঝে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে—তা অনেক, তা অসংখ্য—কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, 'তিনি আছেন, তিনি আছেন' এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজ-মান।' একের আনন্দের কথাই আদত্তের। তাই উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থ করেছেন—

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সেই এক যিনি তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।'

এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রামমোহনীয় এক প্রচারমন্ত্রই, ভারত-সাধনার মহতী বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথ তাই 'ছোটো ও বড়ো' বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করলেন—'সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং', সেই 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ', সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অন্তে-পরিব্যাপ্ত, সেই-যে 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,' যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।'

রবীন্দ্রনাথের শুভবুদ্ধির চিন্তনে রামমোহনের শুভচৈতন্যে ঔপনিষদিক উত্তরাধিকার, একই মৌলবিন্দু থেকে পরিবৃত্ত রচনা। ঔপনিষদিক রামমোহন, ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ।

'বিশ্ববোধ' অংশের মধ্যে তাই অর্থসহ উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের—

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।'

রবীন্দ্রসংগীতের সুরধ্বনিতে বাণীবদ্ধ তাই—

'আকাশ ভরা সূর্য-তারা বিশ্ব-ভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোব স্থান।'

এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সকল ভাণ্ডেব অবস্থিতি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেও সেই বোধেরই আলোক-বর্তিকা অনির্বাণ-শিখায় জাজ্বল্যমান। আমরাও সেই আলোকেই অলোকিত।

রামমোহন তাই 'কবিতাকারের সহিত বিচার' প্রত্যুত্তরে উল্লেখ করলেন মনুসংহিতার উক্তি—'যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান ভাব পাইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।'

ব্রহ্মজ্ঞানই রামমোহনের বিশ্ববোধ।

॥ তিন ॥

রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গের এক কথায় কোনো পরিচিতির উল্লেখ করতে হলেই সতীদাহ প্রথার সহমরণ প্রতিরোধের অভিযাত্রী রূপে বর্ণনার প্রয়োজন হয়। অথবা বলা যায় রামমোহন রায় নামটি বললেই সতীদাহ প্রথার সহমরণ প্রতিরোধক আন্দোলনের কথা স্মরণে এসে যায়ই।

যদিও গবেষকদের নজিরকে নিয়ে অনেকেই বলবেন যে, ১৮১৭ খৃস্টাব্দের সময় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নারীর সহমরণকে অপছন্দ করে অভিমত জানান। এটি তাঁকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকেরই অনুরোধে প্রদান করতে হয়। তার তিনি সংস্কৃত ভাষায় এক মতামত জানান।

কিন্তু এ শুধু বিরূপতার মত দেওয়া, তাতে কোনো সমাজ মানসের মধ্যে প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা নেই। এই প্রতিবিধান প্রচেষ্টার অগ্রনায়ক রামমোহন রায়। তিনি সামাজিক মানসিকতায় জীবন্ত দগ্ধ করার মতন অকল্পনীয় অপকর্ম না করার মনোভঙ্গিমাই গড়ে

তুলতে চাইলেন। তাঁর চিন্তায় স্বাভাবিক অনীহায় সতীদাহ প্রথার কুকীর্তি না করার মন শুভবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠবে। তাই তিনি বাদ-প্রতিবাদে যুক্তিশীল পথে অগ্রসর হলেন বলেই তার প্রামাণ্য তারিখ ১৮১৮ খৃস্টাব্দের দেখা যায়। কারণ ঐ সময়েই প্রকাশকাল 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুস্তিকাটি। যদিও মুদ্রণের মধ্যে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই কিন্তু ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ খৃস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' এই প্রকাশের সমালোচনা প্রচাব করেন। সেখানে 'সহমরণ' শব্দটুকুর উল্লেখ লেখা হয়—'কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।'

রামমোহনের এই সতীদাহ বিরোধী মনোভঙ্গিমার সূচনা এই পুস্তিকার প্রকাশকাল ধরলে কি সঠিক হয়? বোধ হয়, হয় না। যেমন প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর কালকে ধরাব কথা রবীন্দ্রনাথ মনে রাখতে বলেছেন, এখানেও তেমনি এই পুস্তিকা প্রকাশের আগেই রামমোহন মানসে সতীদাহ বিরূপতা সজাগ হয়েছিল নিশ্চয়ই। এবং তার ফলেই এই কুপ্রথার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার সূচনা হয়। যার ফলেও হয়তো-বা প্রয়োজন হয় হিন্দু পণ্ডিতের অভিমত গ্রহণেরও। একজন কাজ আরম্ভ করেন প্রাথমিকভাবে যা বহুজনের প্রামাণ্য রেখায় ধরা যায় না। তাকে প্রস্তুতির পর্ব বলা যায়। সেই প্রস্তুতির কাল একাধিক বছরের আগেরও ধরা যায় এবং তা ধরাই স্বাভাবিক। একদিনেই এই অকর্মের কদাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কেউ-ই হয়ে উঠতে পারেন না। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পরিণতি রূপেই লেখালিখির সময় উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রেও ধর্তব্য রামমোহনের মনোলোকে এবং আলাপ-আলোচনায় সতী-প্রথার তিক্ততার কথা প্রচারিত হয়েছিল। এবং তিনি এ বিষয়ে সোচ্চারই ছিলেন।

অনেকেই তাঁর নিকট আত্মীয়ার সহমরণ দেখার কথা বলেছেন। তাঁরা সেই অসহনীয় কুকর্মকের প্রাথমিক মনের গভীরে বিক্ষুব্ধ ভাব গঠনের ইন্ধন বলেছেন। তা হতেই পারে হৃদয়বান পুরুষের বিবেকে। সহৃদয় পুরুষ রামমোহন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এটিকে অমানুষিক একটি নিকৃষ্টতম নারীনির্যাতন রূপেই। তাঁর কাছে তাই এই বিরুদ্ধ অভিমত দেওয়ায় মানবিকতার পক্ষ সমর্থনই বড় কথা। তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন, নরনারীর সমান মনুষ্যত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বলা—নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিতে চেয়েছেন।

রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামকরণেই বোঝা যায় দুজনার কথিকা। একজনের প্রশ্ন আর অন্যের উত্তর এই ভাবের রচনা। এই কথিকায় পর পর সাথ জবাবী পাঠক পেয়ে যাচ্ছেন। পাঠকের দরবারে দুপক্ষের কথাই বিবেচনার সামগ্রীরূপে তুলে দেওয়া হয় রামমোহনের এই রচনায়। তাই যুক্তিশীল মানসের মনীষারূপে রামমোহনকে এই রচনায় খুবই প্রত্যক্ষ লাভ করার সুযোগ রয়েছে। এবং তাঁর রচনার পরিশীলিত অভিব্যক্তিকেও ছোঁয়া যায় এখানে।

অনুরূপ রচনা 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। রামমোহনের আগের প্রকাশনের জবাবীরূপে। আর এরই আবার জবাব দান করেন রামমোহন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ করে। যার প্রকাশকাল ঐ বছরেই।

১৮২৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ দেখা যাচ্ছে 'সহমরণ বিষয়' নামে আরো একটি পুস্তিকা। এটিও রামমোহন প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক জবাবই।

আসলে রামমোহনকে একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হয়েছে লেখনী ধারণ করেও যার সময় কাল যতটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে ১৮১৮ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত।

এই সময়কালকে বলা যায় রামমোহনেব সতীদাহ বিরোধী লেখনী-ধারণের প্রহর। আর বলা যায় তিনিই তো সেকালের মানবতাব প্রহরী।

রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন বৈধব্যনারীব—চেয়েছিলেন ব্যক্তিত্বেব দৃঢতায় নারীর মর্যাদা, মানবতায় স্বাভাবিক স্বাধীন মতামতের বলিষ্ঠতা। স্বার্থপর সামাজিকতার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত নয় নারীজীবন—এ কথাই বলতে পেরেছিলেন রামমোহন রায়। তিনি শুধু হৃদয়ানুভূতির তাড়নায় এ কথায় অগ্রণী ছিলেন না শাস্ত্রেরও যুক্তিতে মুক্তি দিতে চেয়ে ছিলেন সমাজ-বন্ধনের নিগড় থেকে নারী-জীবনের অমর্যাদাকে। তাই নারী-জাগৃতির প্রথম সূর্যোদয়ই রামমোহনের মানস-আকাশে। তিনি সতীদাহ প্রথার সহমবণকে অশাস্ত্রীয় অনাচার বলেই ঘোষণা করলেন সোচ্চারে।

'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুস্তিকায় প্রথমেই প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন দিয়ে তার পরে নিবর্ত্তকের উত্তরটি দিয়েছেন। বলেছেন—'সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহাব অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।'

এই বক্তব্যের পর বামমোহনের প্রামাণ্য নজিব স্থাপন মনুসংহিতা এবং বেদ থেকে। যেখানে নারীর পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচাবিণীব জীবনযাপনের কথাই উদ্ধৃত। গীতার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষও উল্লেখের মধ্যে রেখেছেন। এবং এখানে তাঁর শেষ কথা—'এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশেব অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।'

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' পুস্তিকার রচনায় রামমোহন একটানা প্রতি বিষয়ের প্রতিবাদ স্থাপন কবেছেন। স্থাপিত করেছেন অপব্যাখ্যার উপস্থাপনাকে নস্যাৎ করার। এবং প্রকাশ করেছেন অসৎ প্রক্রিয়াই এই সহমরণ প্রথাটি। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৭৪১ শকের এই রচনার ইতির রেখা টেনে রামমোহন বলেছেন—'দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।' এই সহানুভূতির উক্তি রামমোহন মানসের আদত পরিচয়।

রামমোহন 'সহমরণ' বিষয় রচনায় প্রথমেই লিখছেন—'গীতাদি শাস্ত্র বিচারকে গালিতে মিশ্রিত যে করে সে কি প্রকার নীচ হয়।' এ একেবারে খোলাখুলি ভাবে রামমোহনের উক্তি। তিনি বিকৃতভাবে প্রাচীন উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যাকারকে নিম্নস্তরের জীবই জ্ঞান করেছেন এবং যাতে যথার্থ বিচারবোধ রামমোহনের। তাই বলতে পেরেছেন—'যাহারা ধর্ম্মকে বাণিজ্য করে তাহারা মূঢ় এবং যাহারা ফল কামনা করে তাহারা নরাধম'। রামমোহন প্রতিবাদ বা জবাব যুক্তিযুক্ত ভাবেই দিয়েছেন এবং বেশ মননশীলতার সঙ্গেই। তার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃতি দিতে উল্লেখ করা যায়—'মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধছাত্র আধুনিক স্ত্রীসকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি মুগ্ধবোধছাত্র সূর্য্যাদি দ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তি দ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন।' রামমোহনের বাচনিক বৈশিষ্ট্যও এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি বোধের গভীরে উপনীত করছেন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে। আর অনেক প্রতিবাদ স্থাপনের শেষে রামমোহন বলেছিলেন—'কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্ম্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে ইতি।' ১৭৫১ শকাব্দের এই যে রামমোহনের কথা এই তো শাশ্বত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদী মনুষ্যত্বেরই কথা।

রামমোহন মানবতাবাদী মনুষ্যত্বেরই জয়ঘোষণাকারী।

তিনি মানবজীবনে ধর্মাচারণ চাইলেন কিন্তু ধর্মের মুখোশে ধূর্তামীকে নয়। তিনি মানবকে সহৃদয় ব্যক্তিত্বে জাগ্রত দেখতে চাইলেন কিন্তু অতি-অগ্রণীর ভূমিকায় সমাজ-জটিলতার সৃষ্টিকারী রূপে নয়। নরনারীর জীবনকে চাইলেন জগৎ-জাগৃতির আলোকের ঝরণাধারায় ধুইয়ে দিতে। এই মানস-মনীষাই রামমোহন ব্যক্তিত্বের মৌলবিন্দুতে। রামমোহনের মানবতাবাদই সতীদাহ প্রথার সহমরণ বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী করে। তিনি মানবদরদী।

॥ চার ॥

রাজা রামমোহন রায় ভারত-সাধনায় প্রদীপ্ত পুরুষ।

তাঁর জীবনচর্যায় ও প্রকাশনচর্চায় এই ভারতীয়ত্বের অনুশীলন। তিনি নানাবিধ প্রকাশনার কর্তব্যকর্মে নিরত থেকে শাস্ত্রীয় আচার ও মন্ত্রবদ্ধপদ্ধতির ভাষান্তরের দায়িত্বও প্রতিপালন করেছিলেন। প্রথমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'য় স্বরচিত ব্রহ্ম-সংগীত যেমন গীত হয় তেমনি ব্রহ্মসাধনার মধ্যে বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ-উপযোগী বাংলায় ভাষারূপ প্রদানও করেছিলেন। তার কিছু-কিছু ইংরেজি অনুবাদও পুস্তিকাবদ্ধ হয়েছিল।

মৌলকথা যা রামমোহনের তা হচ্ছে বুঝে আরাধনায় নিযুক্তি। মন্ত্রোচ্চারণ করবে, বুঝে করা। তাই আপন-মুখের ভাষায় অর্থবোধ করানো। এই অজানাকে জানানোর কাজ করেছিলেন সেদিনেই রামমোহন।

'গায়ত্রীর অর্থ' প্রচারিকায় ১৮১৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত পত্রের ভূমিকায় লিখছেন—

'বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্ গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধিবাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।' এটি ১৭৪০ শকাব্দের।

এবং পরেও লিখছেন—'ওঁকারশব্দের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।'

তাঁর ভূমিকার শেষ কথাই স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন—'বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।' জপমন্ত্রের সাফল্যই রামমোহনের সদিচ্ছায়। মন্ত্রের অর্থবোধই তাঁর মন্ত্রণা।

তাই তিনি মন্ত্রকলির একেব মধ্যে ভাষান্তব করেন—'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদেব অন্তর্যামিরূপে আমরা চিন্তা কবি যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে প্রেরণ করিতেছেন'।

একান্ত মনের এ এক ঐকান্তিক প্রার্থনার বাণীমন্দ্র।

'আত্মানাত্মবিবেক' পুস্তিকার প্রকাশকাল ১৮১৯ খৃস্টাব্দ। কিন্তু মৌল বিরচক সুদূর অতীতের আদি শঙ্করাচার্য সুনামেই। সেই শুভবার্তাকে রামমোহন বাংলায় ভাষান্তরিত করেছিলেন। সংস্কৃতের এক-একটি বাক্যাংশেব বাংলা রূপ উপস্থাপিত করেছেন। এইখানে রামমোহন আমাদেব আদৃত বৈদান্তিক ভাব ও ভাবনাকেই পর্যালোচনার সুযোগ প্রদান করেছেন। তিনি বেদান্তের বাণীকে নিজস্ব ভাষায় উপলব্ধির উপযোগী প্রকাশনার প্রবর্তন করেছিলেন। তাই আমাদের গবেষকবৃন্দ হদিস পেলেন ১৮১৯ খৃস্টাব্দের বাংলা গ্রন্থের তালিকায় এমনি একটি প্রকাশনার কথাও যাকে রেভারেণ্ট লঙ্ সাহেব উল্লেখ করে গেছেন।

আর আমাদের উল্লেখেরও প্রয়োজন রামমোহন প্রচারিত শঙ্করাচার্যের আত্মার বিবেকজাগৃতির কথা। যা মানবজাগরণের মৌল বিজ্ঞান। রামমোহন সেই বিজ্ঞান প্রচারক প্রজ্ঞানীই।

'প্রার্থনাপত্র' রচনাটির মধ্যে রামমোহন এক ঔদার্যপূর্ণ মানসিকতার বক্তব্যকে উজ্জ্বল-রেখায় অঙ্কিত করেন। এটিকে ১৮২৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশ ও প্রচার হয় বলে গবেষকবৃন্দের ঘোষণা। রবীন্দ্রনাথে কেন রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' প্রচারের আগের এই বক্তব্য বিশেষ স্মরণীয়। 'ক্যালকাটা জার্নাল'এ এর উল্লেখ হয়েছে। তাই মনে করা যায় তৎকালে এটি সর্বসাধারণের দরবারে বহুল প্রচার লাভ করে। অথবা ভাবা যায় রামমোহনেরও সর্বধর্ম সহিষ্ণুতাবোধের কথা জনমনের কাছে উপনীত হয়। তিনি এতে লিখছেন—'দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও

দাদূপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সপ্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়।'

রামমোহন রায়ের শুভবুদ্ধির কথাই হচ্ছে এই ভ্রাতৃভাব।

তিনি বিদেশীয় বিশেষ করে ইউরোপীয়দের খৃস্টের আরাধনার ক্ষেত্রের বিভিন্ন মতের কথায় একটি আত্মীয়তা বোধকে উপলব্ধির কথা বলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত তাই—'উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।'

তাঁর মৌল বক্তব্যের অন্তঃসলিলে দ্বেষভাব-মুক্ত বিভিন্ন ধর্মধারাকেই সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিবেচনা করা।

১৮২৬ খৃস্টাব্দ বা ১৭৪৮ শকাব্দের প্রকাশ 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' রামমোহনের ধর্মধ্যানের এক সূত্রসার। বিশেষ করে তাঁর ঔপনিষদিক মন মনুসংহিতার প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি ও বাংলানুবাদ গৃহীর অবশ্য-অবশ্য প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বিধৃত এখানে। একান্তভাবে একজন গৃহী ব্রাহ্মের প্রতি রামমোহনের নীতিচুম্বক, যাকে তিনি আচরণীয় বোধ করেছেন।

এর পরের বছরই মুদ্রিত 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং' প্রচারিকা। ব্রাহ্ম অভিমতের যথার্থ উপাসনা গায়ত্রীর মন্ত্রকে ভাষান্তরিত এবং তাঁর একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি প্রদান। তিনি যে গায়ত্রী ছন্দের বিশ্বাসভূমিতে বিচরণ করেছেন এ তারই প্রামাণিকা।

আবার এই বছরেই 'বজ্রসূচী' মুদ্রণ হয়। যাতে আমাদের চারিবর্ণের কথা বর্ণনার অন্তে তিনি বলছেন—'করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়'। এ তো রামমোহনের ব্রাহ্মণত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণই বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার সত্যবাদিতাকেও স্মরণিকাই এখানে। রামমোহন শুচিশুভ্রের ব্রাহ্মণসত্তার আমন্ত্রক। তিনি 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে বললেন—'ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্যসাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।' ১৩০৯ আষাঢ় লেখার এই রচনা 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' গ্রন্থভুক্ত রবীন্দ্রনাথের।

'ব্রহ্মোপাসনা' রচনার প্রচার পরের বছরই ১৮২৮ খৃস্টাব্দে। রামমোহন যেমন ব্রহ্ম-ভাবুক তেমনিই আবার উপাসকযোগ্য ব্রাহ্ম-আচার সাধনায়। তাই শিক্ষাযোগ্য বক্তব্য শাস্ত্রধারার অনুসরণে বাংলানুবাদসহ প্রকাশ ও প্রচারে তৎপর ছিলেন। প্রথমেই এখানে বলছেন—'মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন'। তিনি তাই লিখছেন—'এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা'। এবং দ্বিতীয় বলছেন—'পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।'

এই মহৎ মানসিকতার দীক্ষায় রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদের শিক্ষা দেওয়ার পরিণতির সাফল্যেই পরে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' বক্তব্যে 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার

মধ্যে বলছেন—'বর্তমান কালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীন কালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে—এই একটি আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে আজ ফুটে উঠেছে।' তিনি বিশ্বমানবের মুক্তির মন্ত্রকে ভারতই পৌঁছিয়ে দেবে যে তা অভিমত দিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অবদানের কথা বলতে গিয়েই। কারণ তাঁর অভিব্যক্তিই হচ্ছে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটিই তা হচ্ছে নবজাগরণের বাণীমন্ত্রের উদ্গাতার। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল, ব্রহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।' এবং তিনি এর পর ফল যা তাকে বলছেন—'হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।'

যদি ধরা যায়, এই জেগে ওঠার মন্ত্রকার আদতে রাজা রামমোহন রায় তা হলে যথোপযুক্ত চিন্তাই হবে। তাই তো তিনি যে উদার শুভবুদ্ধির মৌল বীজ বপন করলেন, তারই সাফল্য এই জাগৃতির।

রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা' প্রকাশের পরের বছরই 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকাটি প্রকাশ পায়। অবতরণিকায় প্রথমেই তিনি বলছেন—'উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন।' রামমোহন চাইতেন শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত জনমানসকে আর সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদেরকে অনায়াস-উপযোগী সনাতন উপাসনাকে জানানো। এখানে চিন্তা করার বিষয় একটিই এসে যাচ্ছে, যা রামমোহন কথিতই। তিনি বলছেন অনায়াসে সমর্থ করার জন্যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির প্রয়োজনে 'সনাতন উপাসনাকে' সংক্ষেপে উপস্থাপন করছেন। মনে রাখার বিষয় এই শব্দদ্বয় 'সনাতন উপাসনাকে'। নতুন পদ্ধতির কথা বললেন না। বলছেন আমাদের সনাতন ধর্মের আচার ও আচরণের পদ্ধতি-কথাই।

আর তাকে বাংলায় প্রকাশ করলেন কেমন ভাবে, তাও রামমোহন ব্যক্ত করলেন—'শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধসুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, এ কারণ এ স্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।' অর্থাৎ শিষ্যের প্রশ্ন আর আচার্যের উত্তর দেওয়া। এমনি দ্বাদশটি প্রসঙ্গ প্রশ্নের উত্তরে বিন্যস্তই রামমোহনের প্রথম বাংলায়। পরে নানা শাস্ত্রের নাম উল্লেখে মূলের উদ্ধৃতিও এই সঙ্গেই বিধৃত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যা তা হচ্ছে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটির উল্লেখ দুবারেই। রামমোহনের মৌলচিন্তার পরই যা-যা গ্রহণীয় জ্ঞান করেন তারই তো বাংলায় প্রকাশ ও প্রজ্ঞান বিবেচনা। কারণ এগুলিকেই অনুষ্ঠানযোগ্য মননমানসের বস্তুজ্ঞান করেছেন।

যেমন উপাসনা কথার ব্যাখ্যায় দেওয়া—'তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।'

আর উপাস্য বলতে জাগতিকবোধের বিস্তৃত বর্ণনান্তে বলছেন—'শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।'

এই উপাস্যের প্রকার বা স্বরূপ প্রসঙ্গের কথায় অনির্ধারণ সিদ্ধান্তই অভিব্যক্ত। আর এখানে পরবর্তীকালের বলা অনাস্বাদিত স্বরূপ কথাই শ্রীরামকৃষ্ণেরও স্মরণীয়।

এবং এই উপাসনার অবিরোধী বিষয়ে বলেছেন এই যুক্তিতে—'সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন-আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই-সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।'

এক কথায় বিশ্বমৈত্রীর বাণীবাহক হয়েই রামমোহনের ব্রহ্মবাদী মানসিকতা অথবা ধরা যায় আদিতে যে 'আত্মীয় সভা'র গঠন সেখানেও বিশ্বভাবনায় সর্বধর্মের সমন্বয়ী চিন্তা। সকলকে আত্মীয় ভাবনা।

নানা উপাসকেব নানা উপাস্য হলেও বিভেদের বিমুক্তিই রামমোহনের মনোলোকে। তিনি বলছেন—'ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন'। এখানে তো আর বিরোধ নেই তাই তাঁর অভিব্যাক্তিতে—'উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞান-নিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক।' এবং এই বোধেব ভূমিতে দাঁড়ালে তিনি দেশ-কাল-পরিবেশকে অনুকূলের চিন্তার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ দেশের সুস্থির পরিস্থিতিব প্রয়োজনীয়তার কথা এবং চিত্তশুদ্ধির কথাও—উদর প্রেমের চেয়ে উদাব প্রেম প্রয়োজন।

সর্বসাধারণের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তিব এ এক প্রস্তুতিপত্রই রামমোহনের।

আর 'বিতরণার্থ মুদ্রিত' উল্লেখে শ্লোক ও গীতিকা প্রচারিত হয় রামমোহনের, যাকে একত্রে বলা হয় 'ক্ষুদ্র পত্রী'। ব্রহ্মবিষয়ক রচনায়তই এই তো অল্প কয়টিই। অবশ্য মূল রামমোহনের গীতিকবিতা রচনার কথা স্বভাবতই এখানে স্মরণে আসবেই, যা তাঁরই বিশেষ মানসিকতার বোধের আলোকে উজ্জ্বল এবং বাংলা গীতিকার সাংগীতিক ইতিহাসে দিকচিহ্নরূপে উল্লেখযোগ্য। এবং বলা যাবে, রামমোহন রায় গীতকবিও।

আমাদের শুভশুদ্ধজীবনবোধেব আলোকে-আলোকে সুস্নাত করতে গিয়ে রামমোহন যে কি উত্তরাধিকার দিয়েছেন তারই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিলেন ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা উপলব্ধিতে। তিনি বলেছিলেন—'অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায় যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস; সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অনুবর্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।'

রামমোহনই আমাদের এই কূপমণ্ডূকতার সম্প্রদায়বদ্ধ মানসিকতা থেকে বাইরের কাজের প্রেরণাদান করেগেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তারই লেখনীর ধারাশৈলীকার।

আর মনীষিকার সকল পরবর্তী প্রজন্ম এরই বাঞ্ছিত ধারাবাহী!

॥ পাঁচ ॥

রামমোহন সমাজ সচেতন এবং স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ।

তাঁর সমগ্রজীবনের বৃত্তরেখায় এই আপন ব্যক্তিত্বেরই জয়ঘোষণা। তিনি স্বদেশ স্বধর্ম এবং স্বজাতির বিকাশে সহায়ক হয়েছেন। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বাধীনচিন্তার চেতনপুরুষ হয়ে যুক্তিবাদী মনে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন কোনো চিরায়ত মতবাদের অপব্যাখ্যায় অথবা যথার্থ ন্যায়ের বিরুদ্ধে অপযশে। এই ভূমিকাকে রামমোহনের এক অক্রান্ত প্রতিবাদী নায়কের অংশ গ্রহণই বলা যায়। তাই তাঁকে বলতে হয়, একজন ন্যায়দণ্ডধারী স্বদেশের অভিযাত্রী রূপেই।

রামমোহনের আলোকিত রচনার তাই অনেকাংশই এই ভাবের প্রতিবাদীপত্রই।

এমনি ধাবার রচনাই একটি 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। উল্লেখ দেখা যাচ্ছে ১৮২১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে প্রকাশের কথাই। সে সময় রামমোহন এগুলোর প্রকাশকালে লেখায় 'শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা' নাম যুক্ত করে প্রচার করান।

ইংরেজ রাজত্বের কথা উল্লেখের মধ্যে রেখেই সেদিন প্রথম আলোচনার প্রথম ছত্র লেখেন রামমোহন। তিনি বলছেন—'শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র ·বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন।' রামমোহনের মানসসাম্রাজ্যের বোধের পক্ষে এ এক উল্লেখযোগ্য উক্তির অনুধাবনই। তিনি বিদেশীর প্রতি স্বদেশীর বিচারবোধ যথার্থ ন্যায়দণ্ডে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। যা যথাযথ তাকেই অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করেছিলেন।

অর্থাৎ আপন ধর্মাচরণের একান্ত স্বাধীনতার কথা।

কিন্তু সেদিন দেখলেন তাঁর মুক্তদৃষ্টিতে কি? যা দেখলেন তাই লিখছেন—'কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকাবে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পবিপূর্ণ হয়'। এ একেবারে ইতিহাসের আলোয় আলোয় উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র রামমোহন প্রদত্ত। তিনি বলছেন—'দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ কবেন'। রামমোহন সেদিনের কলকাতার বুকে পাদরী সাহেবদের খৃস্টধর্ম প্রচারকের কার্যকে যথাযথ চিত্রিত করেছেন।

আর প্রচারে যখন প্রসার লাভ করে তাদের মতাবলম্বী হয় তখন তাদের হাতেনাতে ফলদান করেও। রামমোহন রায় সে প্রসঙ্গে লিখছেন—'তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচ লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।' আদত কথা তখন সমাজজীবনে আপন ধর্ম থেকে অপর ধর্মগ্রহণে ভালো মতের মধ্যে আসার কথা বোঝানো এবং ভালো মতন জীবনযাত্রায় উপনীত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন। এর আসল চিন্তার মূলে সেই ধর্মের প্রসারই। আপন মতের ধর্ম-প্রচারকার্য।

তৎকালীনের প্রেক্ষাপটে রামমোহন সেদিন চিন্তা করলেন—'বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না'। এমন কথা আজকে চিন্তায় এনে লেখা যতটা সহজ সেদিনে ভাবা ও ভাষায় রূপায়িত করতে পারা সোজা কথার নয়! রামমোহন সেদিন এ কাজ করেছিলেন। তিনি এ কথার যুক্তিযুক্ততার প্রমাণে বলছেন—'যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীডাতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না।' এখানের প্রাসঙ্গিকতায় বোঝা যাচ্ছে অধীনস্ত দুর্বলের প্রতি স্বাধীন সবলের প্রাদুর্ভাবের মর্মপীড়ার কথা বুঝেছেন রামমোহন। এবং তা স্বধর্ম ভ্রষ্ট করাচ্ছে।

এই ধর্মের প্রতি আহত সত্বাকে উপলব্ধি করলেন রামমোহন। সেদিন তিনি এই রচনাতেই অকুণ্ঠিত চিত্তে উচ্চারণ করে লিখেছিলেন—'এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্ম গ্লানি করিলেন'। সেই অতীতের কথাকে একেবারে ইতিহাসের সত্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন এই রচনায় রামমোহন। তিনি উল্লেখ করছেন—'চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুব ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দেব ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিল না তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুব ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত।' ইতিহাসের আলোকে রামমোহন নিজ বক্তব্যে প্রতিষ্ঠার ভূমি রচনা করলেন। এবং বললেন—'পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব

এদেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না'। রামমোহন এমন কথা বলার পর স্বভাবতই মনে আসে রবীন্দ্রনাথের বলা 'ভালো ইংরেজ' আর 'মন্দ ইংরেজ' বিষয়ের ভাবনাকে।

রামমোহন-আলোচিত এই রচনালোচনায় বলছেন—'ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণকর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ক্রটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন।' ইংরেজের যে 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় ধর্মক্ষেত্রে বিদেশীয় আধিপত্যবিস্তার সে প্রসঙ্গেই রামমোহনের বিচার-বিবেচনা। তিনি উপলব্ধি করেছেন—'সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন' তাই তো রামমোহনের রচনাবদ্ধ।

তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজনের সরল জীবনযাপন করার কথা ভেবেছেন। অথচ মহান চিন্তায় চিন্তিত যে তাঁরা তাও ভাবার কথা আভাসে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন —ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে।' ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যকে ভূষণ করে প্রজ্ঞাকে অনুসন্ধানের বিচার করলেন সেদিন রামমোহন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবাদীর ভূমিকাই বড় কথা দারিদ্র্য নয়। ভিক্ষাকে ব্রাহ্মণের ঐতিহ্যে রেখে অপরের ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করেছেন রামমোহন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞানই আদৃত। ভিক্ষান্ন বিদুরের খুদ ব্রাহ্মণের এবং যা ব্রহ্মচারীরও।

রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় সত্যবাদিতাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে বললেন— 'ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়-স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।'

রামমোহনের এই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' রচনার মৌলপ্রেরণায় প্রত্যুত্তর দানই প্রধান। ১৮২১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের চোদ্দই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রটিই রামমোহনকে সজাগ করে। তিনি শিবপ্রসাদ শর্মার নাম দিয়ে প্রতিবাদ রচনা পাঠান ঐ পত্রিকায়। তাঁরা পয়লা সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় পুরো চিঠি ছাপতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তখন ঐ মাসেই রামমোহন একটি একেবারে সাময়িক পত্রিকাই প্রকাশ করেন এই রচনায়। এর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাই বর্তমানে হাতে পাওয়া।

প্রথম পত্রেই রামমোহন খৃস্টান মিসনারীদের পত্রকে 'শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই'

এমন যে জনের লেখা তাই তিনি 'বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ' করলেন বলেই লিখেছিলেন। আর তিন নম্বর পত্রের শেষ করেছেন এই বলে—'আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।' একান্ত যুক্তিবাদী রামমোহন তর্কের খাতিরে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর কোনো বিদ্বেষ প্রসূত মানসিকতা নয়। রামমোহনের সমগ্রজীবন কাজের গতিই অন্যায় অসত্য অমানবিকতার বিরুদ্ধে। তিনি নীতির বিজয় বৈজয়ন্তী।

এই তিনটি রচনায় রামমোহন আলোকিত করেছেন খৃস্টান মিসনারীদের একেবারে তাঁদের লেখা অযুক্তির অভিযোগগুলোকে। কেটে-কেটে তুলে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন চালুনীতে চেলে-চেলে। অখণ্ডনীয় রামমোহনের ব্যাখ্যায়। তিনি হিন্দুধর্মের আত্মাকে উদঘাটিত করেছেন আলোচনায়। তিনি লিখেছেন—'হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্মসংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বরবাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন॥' এ ছাড়া রামমোহন প্রতিমাপুজোর মৌল বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করেছেন যে এই রচনায় তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'যদি আপনি ইহা মানেন যে দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা তাহাই অপ্রপঞ্চ ভাবে উপাসনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে অতঃপর পারিবেন না যেহেতু কোনো ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতনরহিত দেহকে উপাসনা করে না।' রামমোহন বিশ্বধর্মের প্রেক্ষাপটে তাঁর যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তিনি বলেছেন—'গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্যরহিত শবীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলারূপ মাহাত্ম্য কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত।' রামমোহনের বহু জাতিক ধর্মাচরণের রীতিকে উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রবণতা। এবং আমাদের ধারাকেও উপস্থাপনা। তাই তিনি বলেছেন—'হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন।' রামমোহন এখানে আমাদের প্রতিমাপুজোর প্রধান উপজীব্যকেই প্রকাশ করলেন।

তবে এর পরই যে কথা বলেছিলেন সেটাই সবথেকে উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি অভিমত দিলেন—'অতএব আপনকার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্যরহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুত কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্তনির্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবেক।' রামমোহনের সাকার উপাসনার এক সংজ্ঞারূপেও এখানের বক্তব্যকে স্বীকার্য।

হিন্দুদের সমুদয় শাস্ত্রের প্রতি খৃস্টানদের আঘাত দেওয়ার প্রবণতার কথা রামমোহন প্রকাশ করেন এবং তার যথোপযুক্ত জবাবও। আবার যিশুখৃস্টের হোলি গোস্ট থেকে মেরীর গর্ভের জন্ম বিষয়ের কথায় বায়বেলের মতে সন্তানোৎপত্তিকে ধরার যুক্তিতেও আলোচনা করেছেন। আদত কথা রামমোহন হিন্দুর মনে খৃস্টান মতকে আলোচ্য করেছেন। তবে আসল বলার বিষয় ধর্ম ধারণের তাতে কোনো বিরুদ্ধ প্রচার এক-গোষ্ঠীর গ্রাহ্য হতেই পারে না। ধর্ম সার্বজনীন।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচনাকে রাখতে হয়, সেখানে তিনি বলেছেন— "হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের-সমস্ত-জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'

এই বনস্পতিরই অন্তরসত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন রামমোহন।

রামমোহন লিখেছেন—'পুরাণ অল্পবুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন।' এই অল্পবুদ্ধির হিতের জন্যেই ধর্মকথায় রামমোহন প্রবেশ করে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে মে মাসে ইংরেজিতে 'ডায়ালগ্ ফার্স্ট বিটুইন ট্রিনিটেরিয়ান এণ্ড থ্রি চাইনিস্ কনভার্টস্' মুদ্রিত হয় আর আশা করা হয়েছে এর বাংলাও সেই সময়ে প্রকাশিত ধরা হয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থাবলিতে মন্তব্য সুন্দর। বলা হয়—'প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক খ্রিষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত।' তাই রামমোহনের এই অসঙ্গতকে প্রতিপাদন কথোপকথনের ছলে। একে তো সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত করার। কথিকার আদল তাই সবটাই। এখানের উদ্ধৃতিযোগ্য কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রামমোহন নাম দিয়েছেন—'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'। তার তলায় লেখা—'এক গ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহাঁরদের পরস্পর কথোপকথন।'

আমাদের কাছে রামমোহন রায় রচিত আদলেই রচনার সম্পূর্ণটিই তো অবশ্য-পাঠ্য। তিনি কথিকাকারে লেখেন—

'পাদরি—(তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন) ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক ?

প্রথম শিষ্য—(উত্তর করিল) ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য—(কহিল) ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য—(উত্তর দিল) ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে ?

সকল শিষ্য—আমরা জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু আমারদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরি—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য—আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয় এমত বাঞ্ছা রাখি না কিন্তু আপনকার উপদেশ আমারদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদরি—(ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন) তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরি—আহা আমি দেখিতেছি তুমি অতি মূঢ় আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক এ নিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহারদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরি—ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়।

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় হয় কিন্তু আমি জানি না কিরূপে তোমাকে বুঝাইব এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য—(হাস্য করিয়া কহিল) মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি—আহা স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে। (পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, যে) কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য—অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সঙ্খ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর দুই হয়েন; সে যাহা হউক তোমারদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য—সত্য বটে আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে ঈশ্বর দুই কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরি—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে এক জন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদরি—কি বিপদ্ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। (পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে) তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উঁহার-দিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই ; আপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা বুঝা যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদরি—এ যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য—এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বস্তু বর্তমান আছে ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদরি—এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য—আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক আমারদিগের বুদ্ধি আপনকার-দিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃপুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যাতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

পাদরি—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্যে প্রার্থনা করিব, কারণ তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য—এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না ইতি।'

রামমোহন রায় রচিত এ কি বিদ্রূপ রচনা নয় ?

তাঁর প্রকাশভঙ্গিমায় একে কি বাংলা একাঙ্কিকার রচনাশৈলীর প্রাক্-সূচনার নিদর্শন রূপে গ্রহণীয় নয় ?

শুধু বন্ধনী দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে বক্তার বাচনিক প্রসঙ্গের লেখকের উক্তিকে একটানা ছাপা হয়। তাই রামমোহনকে বাংলার ব্যঙ্গধারার লেখক রূপে আর একাঙ্কিকা নাট্যধারার পথিকৃৎকৃতির পরিচায়িকার সূচকরূপে মর্যাদার দাবিটিকেই তো স্থাপন করা যায়। এই একটিকে নিয়ে এতো কথা বলা যায়, এই ভাবনাতেও যে যিনি গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন আর এমনি কথিকা রচনা করেছিলেন, তাঁর নিশ্চয়ই আরো রচনা ছিল। যা কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে বা নানা স্থানে পরিক্রমায় চঞ্চল জীবনে রচনাবলীর চয়ন যথাযথ হয় নি। তবে এইটুকু বললেই বোধ হয় আমাদের যথেষ্ট হবে—তিনি ছিলেন এই রচনাবলীর অপেক্ষাও বড় রচনাকার! আর তাই দুঃখ এইখানেই এইজন্তে যে রামমোহন যদি আর না লিখে থাকেন তা হলেই।

আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এই ধারার ছোঁয়া পেতে পারি যা ব্যঙ্গবিদ্রূপে ও কথিকায় রচিতও। 'হাস্যকৌতুক' সংকলনের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে গদ্যনাট্যভঙ্গিমার রচনার প্রস্তনা সেখানে এই রামমোহনের একাঙ্কিকাধারার প্রবাহই। রামমোহনও সেকালের সাধারণের মধ্যে যে বোবাবোধ খৃস্টধর্মের বিষয়ে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সেকালীন উপলব্ধি। প্রকাশ ভঙ্গিমায় যৌথ মিলন ব্যঙ্গের লেখনী ও কথিকা।

রামমোহনের এই রচনার সম্পূর্ণটি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথের 'পেটে ও পিঠে' 'অভ্যর্থনা' 'রোগের চিকিৎসা' 'চিন্তাশীল' 'ভাব ও অভাব' 'রোগীর বন্ধু' 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' 'আর্য ও অনার্য' 'একান্নবর্তী' 'আশ্রমপীড়া' 'অন্ত্যেষ্টিসংকার' 'রসিক' 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি পড়ার মধ্যে দিয়ে মন কিছু একটা চিন্তাভাবনা করায়। 'ছাত্রের পরীক্ষা'য় যখন পড়া যায় যে ছাত্র বলছে উদ্ভিদের উদাহরণ জানাতে বললে মাটি ফুঁড়ে ওঠার বস্তু কেঁচোর কথা বলছে আর কাননে কি ফোটের উদাহরণে বলছে কাঁটা। আবার সিরাজউদ্দৌলাকে ইতিহাসে কে কেটেছে প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র বলে পোকায় এবং দেখায়—'শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে ?'

রামমোহন-বাচনিক ধারার সাজুজ্য সন্ধানে দেখি 'সূক্ষ্ম বিচার' রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—'কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব।'

এ প্রায় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের এই কেবলরামের মতোই রামমোহনের সকল শিষ্যের উক্তি—'এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না'।

রবীন্দ্রনাথের চণ্ডীচরণ প্রথম কথা ধরে অনেক বাকচাতুরির মধ্যে এক জায়গায়ই চক্রাকার-বৃত্তেই ঘুরপাক খেয়েছেন বা বলা যায় ভাষান্তর বাক্যে করেছেন কিন্তু ভাবান্তরে পৌঁছতে পারেন নি। রামমোহনের পাদরিও স্পষ্ট কথায় ভাবপ্রকাশ করতে পারেন নি। ফলে ঈশ্বর সম্পর্কে তিন চৈনিকের তিন উক্তি।

এখানে এখন কেউ দ্বিমতের সম্মুখীন হবেন পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যের নিদর্শন এনে।

বলবেন সে দেশের শারাড ধরণের নাট্য-খেলার মার প্যাঁচের কথারই বাংলা রূপরেখা রবীন্দ্র-রচনায়। এই কৌতুকনাটিকার সবগুলোই 'বালক' আর 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'হেঁয়ালিনাট্য' নামে প্রকাশ লাভ করে। যার মৌলপ্রেরণায় বালক-হৃদয়কে আমোদিত দান। রামমোহন পাদরি আর তিন চৈনিকের কথোপকথনে বালক সুলভ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়েছেন যার মধ্যে হাস্যকর তর্কের যুক্তিই প্রতিপন্ন হয়। এই কথার হেরফের ভাববস্তুতে উভয় রচনারই মৌলিক আবেদনে।

রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' রচনায় গুরুভক্তির নিদর্শন শিষ্যদের মধ্যে যুক্তিহীন কথায় কি ধরণের হাস্যকর হতে পারে তা দেখিয়েছেন। এ প্রায় রামমোহনের প্রদত্ত বিচার-প্রকাশের এক বৈপরীত্য-চিত্রই। তবে প্রকাশ উদ্দেশ্যের ঐক্য বর্তমান এবং ভাবনার দিকে রচনার বৈচিত্র্যে যা অবশ্যম্ভাবী। তাই রবীন্দ্রনাথেব শিরোমণির গুরুবাক্যের অযৌক্তিক মধুবর্ষণেও গদ গদ ভাবে শিষ্যের উক্তি—'গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে!'

এ এক নির্ভেজাল শিষ্যত্বের চিত্রকে ব্যঙ্গ-রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের আর পাদরির অসার উক্তির যুক্তিশীলতায় প্রায় প্রতিবাদই তিনজনেব দ্বারা রামমোহনের। তবে মৌলকেন্দ্রে গুরুশিষ্যের কথাকলিই।

এই কথার কচ্‌কচিতেই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ এখানে এখন যথাযথ কথাকার এবং কথাশিল্পীই।

হয় তো 'ব্যঙ্গকৌতুক' রচনার রবীন্দ্রনাথের মনকেও স্মরণে রাখা যায় রামমোহনের এই একটি রচনারই সূত্রকে কেন্দ্রবিন্দু করে। যেখানে দুজনার বক্তব্য আছে। তবে তা 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'—বলা যায়।

রামমোহন মূলতঃ খৃস্টধর্মের সাধারণভাবে যে ত্রীশ্বরাত্মক মতবাদ তারই অযৌক্তিতাকে প্রমাণ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কথা ও কাজের আমূল অসারতার প্রতি সুকৌশলে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। মৌল ভাবনার জগতে শাশ্বতকে বোধগম্য করানোই উদ্দেশ্য এবং কথোপকথনই রচনাশৈলীর প্রকাশ মাধ্যম এখানে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের।

সে হিসেবে বাংলায় এ ধরনের রচনার আদি রূপকার রাজা রামমোহন রায়।

তিনি উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রথায় তাঁর বাদ-প্রতিবাদের জবানী জবাবী রচনা প্রচার করেছিলেন। সেও কথপোকথনের রচনাশৈলীর অন্তর্ভুক্ত! তবে ব্যঙ্গার্থ কথিকা বিরল এটি ভিন্ন। অন্য যদি লিখেও থাকেন তা অজানার জগতে অবলুপ্তই। আমরা রামমোহন-রচনার একটিই পাই।

তাঁর এ ধারার একাধিক রচনার হদিশ আরো না পাওয়া গেলেও একেশ্বরবাদী রাজা রামমোহন রায় একক এবং অদ্বিতীয় একাঙ্কিকার হাস্যকৌতুক সরসতার ক্ষেত্রে। একই আদি এ স্থলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণার দিগন্তে। আমাদের বাক্যের ব্যঙ্গ প্রয়োগের নিরীখেও রামমোহনের এ রচনা আদি রূপশিল্পীরই রূপায়ণ।

॥ ছয় ॥

নীবব নয় সরব—রাজা রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জীবন ও জীবনী।

এবং তাঁর রচনারাজিও।

আমরা দেখি তিনি ভারত-সংস্কৃতির ধারায় অবগাহন করে এমনি প্রগাঢ় ঐতিহ্যে আশ্রিত হয়েছেন যে, সেই ঐশ্বর্যের অবমাননা বা বিকৃত ব্যাখ্যাকে বরদাস্ত করেন নি কোনো সময়েই। তাই বারবার তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। তিনি অন্যায় অযৌক্তিক অপব্যাখ্যাকে সঠিক টীকায় উপস্থাপন করেছেন।

তাই বলা যায়, রাজা রামমোহন রায় আদি শংকরাচার্যের পর আবার দীর্ঘকাল ব্যাপী কলুষিত যে শাস্ত্রীয় সম্পদ তাকেই আধুনিক যুগমানসের দরবারে উপস্থাপিত করলেন তাঁর যুগোপযোগী প্রজ্ঞানে। তাঁর ব্যাখ্যাকে যদি কেউ বিরোধের দৃষ্টিতেও দেখতে থাকেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই তবে যে প্রতিপত্তি নিয়ে প্রতিবাদ করা যায়, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিমায় বিভূষিত। তিনি শাস্ত্রকে তাঁর দৃষ্টিতে অনুশাসনের সনাতন সংস্কারপন্থা থেকে মুক্তির আলোকে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং ভারত-শাস্ত্রকারের স্বর্ণপেটিকাকে সর্বসাধারণের বোধ ও বুদ্ধির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অথবা বলতে পারা যায়, ভারত-সংস্কৃতির আধুনিক অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়।

'সমাচার দর্পণ' তখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদনা করেন এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশক। ১২২৮ বঙ্গাব্দের ২৫ চৈত্র ইংরেজি ১৮২২ এপ্রিল ছয় তারিখের পত্রে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় চারটি প্রশ্ন সম্বলিত। পত্রলেখক 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'।

রামমোহন রায় জবাব দিলেন এরই এক পুস্তিকা প্রকাশ করে। এবং তা পরের মাসেই 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকাকারে হয় মোট ছাব্বিশ পৃষ্ঠার।

তিনি 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রদানের প্রারম্ভে ছোট্ট ভূমিকায় লিখছেন—'চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম'। এ কথা বলেই রামমোহণ স্বস্তি পেলেন না মনে হয়। তাই একটানেই লিখছেন—'এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম'। আর তিনি এই প্রতীক্ষার কারণস্বরূপ ব্যাখ্যায় এইসঙ্গে রাখলেন—'যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।' এমনি বলিষ্ঠতার সঙ্গে উক্তির পর রামমোহন আরো যা শেষছত্রে লিখলেন তাও তাঁর প্রাজ্ঞমননের পরিচায়ক। তিনি লিখলেন—'তাহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক'। রামমোহন সর্ব্ববাদী চিন্তায় লেখনীকে পরিচালনা করেন। তাঁর বঙ্গভাষীর কাছে উপস্থিতি আবার অবঙ্গভাষীর কাছেও। এই স্বল্প ভূমিকার বক্তব্যের শেষে দেখা যায় রামমোহনের স্বভাব-সৌজন্যের উক্তিতে ইতি হয়েও ইতিকথা বলেছেন—'সম্যগনুষ্ঠানক্ষম

তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট'। এখানে আমাদের কাছে রাজা রামমোহন রায় মনস্তাপের বোধকেও প্রকাশ করেছেন সহৃদয়তার স্বভাবেই।

রাজা রামমোহন রায়ের বিবেক জাগৃতির পরিচায়ক এই উত্তরাবলী। তিনি বিশেষ বোধকে সম্পদ সামগ্রীই করেছেন। তাই যুক্তিশীল রামমোহন স্থাপন করেছেন বিচার বিধানের যথাযথ বিধিকে। তিনি নীতিনির্ভর অথবা মানবধর্মের প্রবক্তা। মানব-মাত্রই নীতির পথিক। হঠাৎ খেয়ালের বসে নয় বা কোনো মতলববাজির ক্রীড়নক নয়। বিবেকধর্মী মানবতা এবং বিবেকই মানব-পরিচালক।

রাজা রামমোহন রায় সেই বিবেকবান মানবধর্মের প্রবক্তা।

তাই স্বজাতীয় ধর্ম আর বিজাতীয় ধর্মের কথায় নিষ্ঠাকেই যুক্তিগ্রাহ্য স্বধর্মের বস্তু বলেছেন। যে নিজের ধর্ম পালন করে সেই ধার্মিক এবং স্বজাতীয় বা বিজাতীয় যাই হোক। যা ধারণ করা হয়েছে তাই ধর্ম। এবং আচার-ব্যবহারকে নিয়েও কথা উঠেছে যা রামমোহন ব্যক্তিগত মানসিকতায় বাহ্যিকতার দিক থেকে আন্তরিকতার দিকেই দৃষ্টিস্থাপনে আগ্রহী দেখতে চেয়েছেন। আর আহার প্রভৃতির বিষয়ে এবং চারিত্রিক যৌবনতাড়নার বিষয়েও বিস্তৃত আলোকপাত করেন রামমোহন। তিনি এই ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রতন্ত্রের রীতিনীতির প্রকাশ্য আলোচনা করেছেন। রামমোহন লিখছেন—'বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়?' রামামাহনের মতে ধর্মধারার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাভূমির সন্ধান। তিনি যুক্তিযুক্ত ধর্মের ধারক।

রামমোহন প্রদত্ত এ বক্তব্যের প্রকাশকাল ১৭৪৪ শকের তিরিশে বৈশাখ।

আর এরই প্রত্যুত্তর পত্র-রূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রচারিত হয় ১২২৯ বঙ্গাব্দের ২০ মাঘ ইংরেজি ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩।

এখানে রামমোহনকে 'নগরান্তবাসী ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী' বলে এক অর্থে কলকাতা নগরন্তের বসতির অর্থাৎ মানিকতলার বসবাসকারীকে বুঝিয়েছেন আবার অন্য অর্থে চণ্ডাল বলতেও এক ভাব হয়। যাই হোক এর রচনাকার ছিলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। তিনি পাথুরিয়াঘাটের হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র উমানন্দনের প্ররোচনায় রচনা করেন। এবং মুদ্রণস্থল সমাচার পত্রিকা প্রেস।

এরই যথাযথ উপযোগী উত্তরপত্রের নাম দিলেন রামমোহন—'পথ্যপ্রদান'। এই বছরের ডিসেম্বরের. মধ্যেই তা প্রকাশ করেন। কারণ 'বিজ্ঞাপনা'র ইতিতে রামমোহন লেখেন ১৫ পৌষ ১২৩০ তারিখটিই। এই বক্তব্যের সূচনা করেছেন এই বলে—'আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম "পাষণ্ডপীড়ন" রাখেন তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।'

আর প্রতিপক্ষের প্রয়োগ করা শব্দকে নিয়েই প্রতিবাদ বুলি আওড়েছেন। লেখেন—'আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক "নগরান্তবাসী" এই পদ প্রয়োগ পুনঃপুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না ॥'

রামমোহন এর আগেই দিয়েছেন ভূমিকা। যাতে প্রকাশ করেছেন একে একে সবিনয়ে প্রত্যুত্তর বিষয়ের সৌজন্যমূলক বক্তব্যে প্রাক্‌কথন। যার শেষ কথা বলছেন—'পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তিসকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।' অর্থাৎ রামমোহন তাঁর উপেক্ষার মানসিকতা নিয়ে উপলক্ষ করেছেন অপপ্রচারের ভুলকে সংশোধন করার কর্তব্যজ্ঞানকে। এই কর্তব্যবোধের করণীয় কর্মের দায়িত্বে ছিলেন রামমোহন। তাঁর মন ও মননে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কিন্তু বিষোদ্গার নয়, শাস্ত্রীয় এবং বিবেকের নীতিনিষ্ঠা নিয়ে সত্যযুক্তির প্রতিষ্ঠা। সত্যের আলোকে ভারতীয় জীবন ও জীবনীর প্রাণকেন্দ্রে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করাই রামমোহনের প্রচেষ্টা। তিনি সেই প্রবল প্রাণের টানে সত্যভূমির সন্ধান দিয়েছেন আধুনিক প্রজন্মের দরবারে।

'নমো জগদীশ্বরায়।'—বলেই শিরোনাম চিহ্নিত 'পথ্য প্রদান' পুস্তিকায় মূল রচনার প্রারম্ভের। আমাদের মনে আসতে পারে—'জয় জগদীশ হরে'। এই পদাবলীর আর্তিকে নিয়ে বা জয়-ধ্বনির মতো প্রণতি নিবেদনের কথা এখানে রামমোহনের। তবে যুক্তিশীল তিনি। পর পর মননশীলতার অলিন্দে এনে সব কিছুকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথবা বলা যায় তিনি বিশ্বাসকে বিচার করিয়েছেন শাশ্বত ভারতীয় ভাবনায়। আমাদের যে সনাতনের কুসংস্কারের মানসিকতা তাকে সুপথে পরিচালিত হওয়ার পথনির্দেশকই হয়েছেন।

রামমোহন রায় প্রদত্ত রচনা এই 'পথ্য প্রদান' যেমন প্রকৃষ্ট-রূপ-বন্ধনের তেমনি প্রকৃত এক তার্কিক প্রবরের যুক্তিশীল বাক্‌প্রতিমা গঠনের উদাহরণ স্থল। তিনি প্রতিটি অযৌক্তিকতাকে যুক্তির দ্বারা মুক্ত মনে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত করেছেন। সুসংস্কৃতিপ্রবর রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় চিন্তাকে মুক্তির দিগন্তে আলোকিত করেছেন।

এটি রামমোহন দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধের 'পাষণ্ডপীড়ন' রচনার প্রতিবাদে। তাই দীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তর মালিকার মধ্যে একটির উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি লিখছেন—'১৮৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্মপুরানীয় বচনপ্রমাণে পাষণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল লোকেরা অভক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পানে রত হয় তাহাদিগ্যে পাষণ্ড করিয়া জানিবে এবং যে বেদসম্মত কার্য্য না করে ও স্ব স্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করে তাহারা পাষণ্ড হয়।' এটিকে উদ্ধৃতি দিয়ে রামমোহন এই সঙ্গেই উত্তর দিচ্ছেন—'যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল চৈতন্যচরিতামৃতীয় উপাসনা করেন ও স্ব স্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্‌ক্তে তত্তৎস্পৃষ্ট অখাদ্য ও

অপেয় আহার করেন তাঁহারা যথার্থরূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধর্ম্ম-সংহারকই বিবেচনা করিবেন।'

তিনি যথার্থ যা তাকেই স্থাপন করেছেন আর বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনার জন্যে ধর্ম-সংহারক সমীপে মুক্তমনে আলোকপাত করেছেন। কারণ আমাদের রাজা রামমোহন রায় তো সর্বকালের আলোক-দিশারী।

আমাদের সমাজজীবনে স্বামীস্ত্রীর বিষয়ের এক জটিলসমস্যার কথা রামমোহন উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই রচনায় তিনি লিখছেন—'স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী-বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বরশাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না; তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচ শিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ববিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়. আর পাঁচ শিকা পুনর্ব্বায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।'

এ একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন রামমোহন। অবক্ষয়ের এই এক অবাক করার বিচিত্র চিত্রণ।

আর শেষের দিকের কথাটিতেও রামমোহনীয় যথার্থ সৌজন্য। তিনি লিখেছেন—'পরমেষ্ঠীগুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থসাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষনীয় হইয়াছে॥'

পাষণ্ডপীড়নের এ এক উপযুক্ত 'পথ্য প্রদান'। অসৌজন্যের প্রত্যুত্তর রামমোহনের পরিপূর্ণ সৌজন্যে প্রকাশ।

রামমোহন সুজন সুভদ্র এবং সুপুরুষ।

পৌরুষপ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী রামমোহন রায়। তিনি অতিপ্রিয়শ্বর বিষয়ের চিন্তায় এক অপ্রিয়কর পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর লেখনীকে ধারণ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর মানসিকতার উচ্চ সাংস্কৃতিক জীবনবোধ ও পরিশীলিত প্রকাশরীতি তাঁকে সব সময়েই এক উচ্চগ্রামে অবস্থিতিই দিয়েছে। আমরা রাজা রামমোহনকে পাই তাঁর পরিমার্জিত রুচিশীলতার রচনাসৌকর্যে।

রচনার আলোকে রামমোহনকে অবলোকন করতে হলে আমাদের অনেক ধারার বিষয়কেই অনুধাবন করতে হয়। তা একদিকে নীতিগত আরেকদিকে সামাজিক রীতিগত।

তিনি উপলব্ধি করেছেন অশাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যায় সাধারণজীবনে কুসংস্কার ধর্মধারার অঙ্গীভূত হয়ে সামাজিকতাকে গোগ্রাসে আত্মসাৎ করছে। তাই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এই অপসংস্কৃতিরই প্রচারকদের বিরুদ্ধে। সেই প্রতিবাদ ছদ্মনামের আড়ালেও প্রকাশিত যা আদতে রামমোহন রচনাবলীরই। তাই যখন কেউ রামমোহন রায়ের রচনাবাজির ঝাঁপি খুলে বসবেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সেইগুলিকে দেখবেন এক বলিষ্ঠ

রামমোহন মনীষার ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে। যা রামমোহন মনীষাকে আমাদের দিগন্তকে স্পর্শ করে আমাদের মনকে একদিকে আদত শাস্ত্রীয় বোধে উদ্বুদ্ধ করে এবং উন্নত করে। আমরা আমাদের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকেই উপভোগ করতে পারি।

তাই রামমোহনের রচনার আলোকে পথ চলায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতির কলিই উচ্চার্য—'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'।

তিনি সমাজজীবনের কথায় রচনার প্রয়োগ করেছেন। এবং তা সামাজিক প্রয়োজনে।

এমনি সব রচনা পাঠের মধ্যে থাকতে থাকতে আমরা পাই তাঁর একটি রচনার সাক্ষাৎ, নাম—'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার'। রামমোহনের এ রচনার প্রথম প্রকাশকাল ১৮২৬ খৃস্টাব্দ।

বেশ একটা চমকে দেওয়ার মতন শিরোনাম।

যিনি ব্রহ্মবাদের ব্রাহ্মমতবাদীর আধুনিক শিরোমণি, তাঁর এই এমনি বিষয়ের রচনা।

হ্যাঁ, এ রচনা আমাদের রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র পৃষ্ঠাভুক্ত। অর্থাৎ স্বীকৃত রামমোহন রচনাব মর্যাদা ভুক্তির মধ্যেই গণ্য করার।

তাই এমনি বিষয়ের আলোচনাকেও রামমোহন রায়ের রচনার আলোকে আলোকিত হওয়ার অবকাশ করা যায়। যা তাঁর মানসিকতার এক উদার দিগন্তের ছোঁয়া দিয়ে যায়।

আলোচনার আরম্ভ করেছেন শিবোভূমিতে 'পরমেশ্বরায় নমঃ' উচ্চারণ কবে।

তিনি এই বিষয়ে লেখনী ধারণের কারণস্বরূপ প্রথমেই প্রচলিত কথাবস্তুকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখছেন—'কোনো বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে "এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে"।' এই যখন প্রচলিত মতবাদ তখন রামমোহন রায় বললেন—'ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন, লোকদৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না।' রামমোহন এমনি বাচনিক বিবৃতির পর মূল বক্তব্যে বলেছেন—'সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন; শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই তাহার প্রমাণ মনু'।

আর তিনি কান্যকুব্জস্থ রীতিকেও স্থাপন করেছেন তাঁর এই বিতর্কিত বিষয়ের বিশেষভাবের পর্যালোচনায়।

এবং রামমোহন শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ ক্ষেত্রে। কোনো স্বকপোল রচিত নির্দেশ নয়। এখানে প্রামাণ্য নজির দিয়েছেন রচনাটির প্রকাশে আর তিনি নাম দিয়েছের লেখক-প্রতিবেদক রূপে—রামচন্দ্র দাস, কোনো কল্পিত নাম বা নিজেকে বলেছেন রামদাস।

তাঁর যুক্তির পশ্চাতে তিনি শ্লোকের পিষ্ঠদেশকে বজায় রেখেছেন সব সময় তাঁর সব-কিছু বক্তব্যের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অর্থাৎ রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির আধুনিক

প্রবক্তা। তিনি তাঁর মানসিকতাকে শাস্ত্রীয় অনুধ্যানে জাগ্রত রেখে আধুনিকায়ন করেছেন। তিনি ঐতিহ্যকে নিয়ে আধুনিক ঐশ্বর্যদান করেছেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের নবযুগ' রচনার উক্তিই স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য; তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধির আলোকে রামমোহনকে উপস্থাপন করলেন মুক্তমনের বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের পুরুষরূপে। কারণ রামমোহন রায় চাইলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেদিনের বিশ্বমুখিনতা। তাই নেশার অজুহাতে জাতিচ্যুত অথবা একঘরে করাকে বরদাস্ত না করতে তিনি ধর্মশাস্ত্রের একপেশে প্রচারকে নস্যাৎ করে উপস্থাপন করলেন আসল উদার মতবাদকে। তিনি ভারতীয় বর্ণাশ্রমের কথায় বর্ণাঢ্য মনকে কার্যকরী করলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যেন মুক্তমনের হাওয়ায় দোল দিয়েছেন তাঁর উদার দৃষ্টিতে।

বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাইলেন রামমোহন।

তাই রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে আরো লিখলেন—'তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না।' রামমোহনের এই অস্বীকৃতির মৌলবিন্দুকেই দিকদর্শন করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন—'তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' আবারো এখানেই বলছেন রবীন্দ্রনাথ—'সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত।' রামমোহন মদ্যপানের অজুহাতে জাতিধর্ম বিভেদের মধ্যে আরকোনো ধর্মত্যাগীর সংখ্যাবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকতে চান নি। শাস্ত্রপ্রামাণ্য যুক্তিতে নেশার সংখ্যা হ্রাসের চেয়ে স্বধর্মহ্রাসের সংখ্যাকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই বোধের উপলব্ধির আলোকে রামমোহন-মানসকে বর্ণনা করলেন—'তিনি বাল্যকাল হইতে অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ

সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণসত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।'

এবং এই ধর্মের সত্যকে আচার-বিচার অনুষ্ঠানের মধ্যে না রেখে রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করাতে চাইলেন রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণের পদক্ষেপে। তিনি জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। সামান্য প্রাচীনকে দিয়ে অসামান্য উদারতাকে লাঞ্ছিত করতে চাইলেন না রামমোহনও। তিনি চিন্তা করেছিলেন স্বধর্মে স্থিতি রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠিত অথচ উদার মানসিকতার ব্যক্তিত্বে সুগঠিত হওয়া। তাই তাঁর মদ্যপানের অজুহাতে অচ্ছুৎ না ভাবা। আজন্ম লালিত ধর্মধারণাকে পরিশীলিত অথচ শাস্ত্রীয় আদত নির্দেশকে অনুসন্ধানে অবগত হওয়াই ছিল রামমোহনের প্রার্থিত। তাই ঔদার্যের আলোকে 'নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে,' বলেই সর্বক্ষেত্রেই রামমোহন বিশ্বাস করতেন।

আর তাঁর জীবনের দিকে চাইলে আমরা জানতে পারি, রামমোহনের প্রভাতী আহারে রুটি ও মধুই ছিল আহার্য। অথচ অপযশের রব উঠেছিল পানাসক্তের। এই সমাজের চরিত্রের মধ্যেই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বের প্রদীপ শিখা নিয়ে সুদৃঢ় পিলসুজ। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে ছিল ব্রহ্মানন্দই অমৃত-নির্ঝর। তাঁরা বিশ্বব্যাপী আনন্দ ও অমৃতকেই অভিনিবেশ করেছিলেন। তাঁরা লৌকিকেব মধ্যেই আলৌকিককে এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতকে অনুসন্ধানী।

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার মধ্যে 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা' আলোচনায় বলেছেন—'এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তার শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।' এই সংস্কার-মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন নতুন যুগের নতুন মানুষ রাজা রামমোহন রায়।

রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর আবির্ভাবের কালকে মাহেন্দ্রক্ষণরূপেই উল্লেখ করলেন—'রামমোহন রায়েব মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।' অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনের দিনে প্রয়োজনীয় কথা বলেগেলেন রাজা রামমোহন রায়।

তিনি ভারত-আত্মার বাণী-উদ্‌গাতারূপে ভারত-ইতিহাসের যুগপুরুষ।

॥ সাত ॥

'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ 'উৎসর্গ' করেছিলেন 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে' নিবেদন করে। কারণ তিনি এই ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা-ব্যাকরণকার বা ব্যাকরণ-প্রবক্তা। তাঁর পূর্বসূরির তালিকা রচনা করতে হলে শীর্ষ নাম রাজা রাম-মোহনের। তিনিই প্রথমে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণেতা এবং পরে এক পাণ্ডুলিপি রচনা করেন এরই আদর্শে বাংলা ভাষায় যা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর ইংলণ্ডে প্রবাস কালেই। যার প্রকাশক হয় তাঁরই প্রদত্ত 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'। প্রকাশ কাল ১৮৩৩ এপ্রেল। নাম হয় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। জানা যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে—'ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বোধে সর্বত্র পরিগৃহীত হইত।' অর্থাৎ পঠনপাঠনের সূচীভুক্ত বই রূপে প্রচারিত হয়।

বাংলা-ব্যাকরণকার রামমোহন রায় রূপে এ এক স্মরণীয় দিকদর্শন পাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই। যিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক এবং মুক্ত মনের প্রচারক ও ব্রহ্মবাদী, তিনি প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকবণকারও যে তা অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর বাংলাভাষায় বলিষ্ঠ যুক্তিশীল গদ্যরচনার বনিয়াদ গঠনের মতনই এ তাঁর আরেক দিগন্তে বিচরণ। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা পাঠ্যপুস্তকের শীর্ষস্থানীয় ভূমিকায় গ্রহণীয় সামগ্রী। এবং বরণীয় রামমোহনের বাংলা ভাষাচর্চাব শিক্ষাবিদ রূপে প্রবক্তাব আসন অলঙ্কৃতকারীই। তিনি ব্যাকরণচর্চায় বাংলাভাষায় প্রথমপুরুষ এবং প্রধান পুরুষ। তাঁব বৈয়াকরণ বিদ্যার পবিচয় তাঁকে অধিষ্ঠিত কবেছে বাংলা ভাষাচর্চার পুরোধা রূপে। তিনি তাই তো বাংলা ভাষাবিদরূপেও পথিকৃৎ।

এই গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণের 'ভূমিকা'য় বলা হয়েছিল—'সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্ রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগেব আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে…।' সহজে আপন ভাষায় আপন ভাষার বৈয়াকরণ কার্যই এটি। যা স্কুলবুক সোসাইটির অনুরোধে 'শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।'

আমাদের এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামমোহন অনুরোধের দ্বারা এই ঐতিহাসিক দায়িত্বটি যথাযথ পালন করেছিলেন তবে তা একমেটে কবা। কারণ এই ভূমিকাটিতেই লেখা হয়েছে—'পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত কবিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টিবও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনাব ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি।' এ ভাষা একেবারে সুস্পষ্ট বক্তব্যে ভরা এবং রামমোহনীয় গদ্যধারারই যথার্থ অনুকারী।

তাই কে বলতে পারে, এও রামমোহনই প্রকাশকের অনুকূলে লেখনী ধারণ করে যথাযথ ইংলণ্ড যাত্রা করেন! অবশ্য এ শুধু রচনাশৈলীর অনুকূলতায় অনুমানমাত্র। এবং বিদেশ যাত্রার পূর্বের এ তাঁর রচনানিদর্শনও।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' আলোচনায় লিখছেন—'রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন'। এর পরই উদ্ধৃত করেছেন রামমোহন বক্তব্য—'গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট; এতদ্‌ভিন্ন, তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্‌ পট্‌ রাম্‌ রামদাস্‌ উত্তম্‌ সুন্দর্‌ ইত্যাদি।'

রামমোহনের এ কথার উল্লেখের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য দিয়েছেন—'রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই।' রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে তাঁর যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে আবারো 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রসঙ্গের আলোচনায় 'অ প্রত্যয়' নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন—'এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলাব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে।' এর পরই তিনি উদাহরণযোগে তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে পাঠককে সজাগ করেছেন।

এখানে শুধু মনে করার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দ ব্যবহার ও উচ্চারণ সম্পর্কের আলোচনা করতে গিয়েও রামমোহনের গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণের কথায় মতান্তরকে উত্থাপন করেছিলেন। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথের বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোকপাতের কালে রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'কেও আলোচ্যভুক্ত করতে হয়েছে এক অবশ্য-অবশ্য স্বীকার্য গ্রন্থরূপেই। তাই বাংলা ব্যাকরণধারার ক্রমিক ইতিহাসচর্চার আলোচনায় রামমোহন রায় শীর্ষভূমিতে অবস্থিত। তাঁর এ ক্ষেত্রের অবদান তাঁকে এক বিশিষ্ট মুন্সীয়ানায় অভিষিক্ত করেছে। তিনি হয়েছেন বাংলা ব্যাকরণচর্চার গৌরচন্দ্রিকার যুগপুরুষ।

রামমোহন গ্রন্থের সূচনাপর্বের প্রারম্ভ প্রকরণে বক্তব্যরচনা করেছেন যথার্থ প্রবন্ধকারের মতনই। তিনি লিখছেন—'সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক এক অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক এক বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।' রামমোহন রায় এই এমন বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে উপমাও উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলছেন—'যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে

আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সকলের উদ্বোধনের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেন'। এ কথায় আমাদের বোধযোগ্য ভাবে শব্দ ও পদের বিভিন্নতা ও তৎসহ অর্থ ও পদার্থের রূপকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাই বলেছেন—'সেই সেই ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই সেই ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।' বাংলা গদ্যে রামমোহনের এ এক প্রয়োজনীয় ব্যাকরণগত গৌরচন্দ্রিকার প্রথম নিদর্শন।

রামমোহন অক্ষর বিষয়ে আবার বলছেন—'দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্দ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ বিশেষ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা সেই সেই শব্দেব বিশেষ বিশেব অর্থ জ্ঞান হয়।" এই অর্থ জ্ঞানকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ রীতির কথাই এখানে রামমোহনের।

দেশভেদে ভাষাভেদের কথাকে রামমোহন স্মরণ করিয়েছেন। তিনি লিখলেন—'ঐ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানা প্রকাব হয়, সুতরাং তাহাকে সেই দেশীয় ভাষা ও সেই সেই দেশীয় অক্ষর কহা যায়।' আর রামমোহন এই সঙ্গে ব্যাকবণ শাস্ত্রেরও সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন এই বলে—'সেই সকল ভিন্নভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থেব আভিধেয় হয়, তাহাকে সেইসেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।'

বামমোহন রায় ভাষা ও অক্ষর বৈচিত্র্যের কথাকে মনে করিয়ে তারই আলোচ্য বিষয়েব আকর গ্রন্থকে চিহ্নিত করলেন। তিনি বললেন—'বৈয়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয়। এক বর্ণ কিম্বা বহু বর্ণ একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহা যায়। পদ সকল পরস্পর অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি, অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইয়াছেন।' রামমোহন এই বক্তব্য উপস্থাপন করার সূত্রেই মনে করেছেন পাঠকের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। তাই পাদটীকায় তিনি চলতি বাংলা কথোপকথনের রূপকেও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি লিখছেন—'বাক্যে পদ সকলের কখন উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন "তুমি যাও," কখন বা কোন পদের অধ্যাহার হয়, যেমন "যাও," অর্থাৎ তুমি যাও। অন্য শব্দ উদ্বোধক হইলে কখন সম্পূর্ণ বাক্যের অধ্যাহার হয়, যেমন "আহার করিয়াছ," ইহা জিজ্ঞাসিলে, "হাঁ," এই উত্তর "আহার করিয়াছি" এই ব্যাকের উদ্বোধক হয়।' আমাদের কাছে এখন ভাববার বিষয় এই যে, রামমোহন সেদিন মৌলভাবে বাংলা ভাষার গদ্য-বনিয়াদকেই লিপিবদ্ধ করলেন এবং তার ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রণেতাও হলেন। আর তাঁর সূত্রে চলতি বাংলার কথ্য উদাহরণকেও সেদিনে আমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করলেন।

রামমোহন এমন ব্যাকরণশাস্ত্রকে চারটি উপবিভাগে এক চুম্বকে পাঠকের দরবারে

উপস্থাপন করেছিলেন সেদিন সহজসাধ্য জ্ঞানে। তাঁর নির্দেশিত ব্যাকরণ বিভাগ হয় এমনি—(১) উচ্চারণশুদ্ধি ও লিপিশুদ্ধি, (২) পদন্যাস ও কর্তা-কর্ম-পুরুষ, (৩) অন্বয় এবং (৪) গুরু-লঘু মাত্রা। অর্থাৎ প্রাপ্তিযোগ রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের গভীরের সূচক নির্দেশক এখানে। তাঁর এক কথায় এ আগাম সূত্রসন্ধান।

তবে আজকের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর পরবর্তীকালের বাঙালীর মুখের ভাষা অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে রামমোহনও যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার মৌলসূত্র আমরা পাই এই 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থের শেষের পৃষ্ঠায় পাদটীকায়। তিনি লিখলেন—'কথোপকথনে ও কবিতাতে "হইতে" ইহার ইকার লোপ হইয়া "হতে" এ প্রকার রূপ হয়। তদ্রূপ "যেমন" হইতে "যেন" ইত্যাদি শব্দের বিশেষ পাঠকেরা অন্য অন্য কবিতা গ্রন্থদৃষ্টিতে জানিবেন।' তাই এই বক্তব্য সূত্রের রামমোহন প্রদত্ত 'ছন্দঃ' বিষয়ের আলোচনায় প্রদত্ত যে কবিতাটি তার উল্লেখ এখানে অপরিহার্য। এই ত্রিপদী কবিতার উদ্ধৃতিটি এই—'নদী যেন গড়খানা দ্বাবে হব্‌সির থানা

দূরে হতে দেখে হয় শঙ্কা।

দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লজ্ঘিবারে শক্তি কার

সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা।'

আমরা তাই বাংলা ভাষায় কথ্যরীতির আদিসূত্রসন্ধানী রূপে রামমোহনকে অবশ্যই স্মরণ করবো। আর তাঁর অনুসারী আজকের চলতি বাংলার রচনাশৈলীর উষাদেব জ্ঞানে রামমোহন রায়ের প্রতি প্রণতি নিবেদন করবোই। আমাদের বাংলা ভাষার তিনিই—'প্রথম আদি তব শক্তি—'।

রামমোহন ছন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আরও তিনটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এখানে। এখন যদি সেদিনের কবিতার প্রচলন বিষয়ে এই উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞানকে গ্রহণ করা যায় তা হলে রামমোহনের কাজে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রয়োজন হয়ে যাবে। কারণ তিনি এই উল্লেখ করায় আমরা জানতে পারছি সেকালের বাংলা কবিতার সামান্য কিছু চলন পরিচিতি।

পয়ার কবিতার উল্লেখ জানাতে রামমোহন দিয়েছেন উদ্ধৃতি—

'রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল।
ডাক্ হাক্ ঢাক্ ঢোল্ মাল সাট্ সার্।
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।'

এবং ত্রিপদীর আবার আরেক বৈচিত্র্যের উদ্ধৃতিও রামমোহন দিলেন—

'আমাকে কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে, করিব দ্বিতীয় কাশী।'

আর তোটক ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে রামমোহন উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

'দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে। / কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে॥'

রামমোহন রায় নিজস্ব সময়কে উত্তীর্ণ হয়ে আগামী প্রজন্মের অগ্রদূত ছিলেন। আবার নিজের সমকালেরও প্রতিভূ ছিলেন। তাঁর বিশেষ করে এই ব্যাকরণ চিন্তায় তা প্রকাশিত। আমরা জানি এবং মানি এক্ষেত্রে লেখনীর ডগায় লেখকমাত্রই 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। কাজেই রামমোহন রায় এই বাংলা কবিতার উদ্ধৃতিতেও তারই অনুসারী নিশ্চয়ই। এই চারটির কবিতাংশই তাঁর সমকাল প্রচলিত কাব্যসম্ভারের নিদর্শন প্রদত্ত রামমোহন রায় স্বীকৃতরূপে। আর অন্যান্য পদবিন্যাস যা ব্যাকরণ শাস্ত্র বর্ণনায় রামমোহন রায় প্রদত্ত তাও তৎকালীন বাংলা গদ্যের দিক চিহ্নই। আমরা রাম-মোহন রায়ের পায়ে চলার পথে বাংলা ভাষার পদাতিক।

'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।' গানের কথা প্রাণের কথাই। রামমোহন সেই প্রাণের কথাকে শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর উপঢৌকনকার। তাঁর বাংলা শিক্ষার ধারায় বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙালীর শিক্ষা-সমাজের প্রতিষ্ঠা। সেই সাম্রাজ্যের তিনিই চিহ্নিত প্রথম সম্রাট। আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী।

রচনাবলীর আলোকে রামমোহনকে অবলোকন কেবল বাংলা ভাষারই মাধ্যাকর্ষণে। কারণ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজি গ্রন্থাবলীর মধ্যে আলোচ্য-আলোক অপ্রবেশ্য রাখা। এ আলোচনায় আবার রামমোহন রায়ের উপনিষৎ ব্যাখ্যায় 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ', 'মুণ্ডক', 'শ্বেতাশ্বতর' বা 'ছান্দোগ্য' ধরা যায় নি। 'গুরুপাদুকা', 'জ্যাগ্রাহী' বা 'খগোল' প্রভৃতির বিষয়েও নীরবতার আশ্রয়ী। এই সূত্রে বলা যায়, রামমোহনের কাছে কলকাতায় ১৮১৬-১৭ খৃস্টাব্দের সময় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী যখন ছিলেন, প্রকাশিত হয় 'কুলার্ণার' বই। রামমোহনকে উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ করে তন্ত্রশাস্ত্রীয় দীক্ষায় রামমোহন রায়ের আনুকূল্য তো বিচার্যই। এমনি আবার 'শারীরক মীমাংসা'। তবে সব থেকে যা প্রয়োজনীয় ছিল তা হচ্ছে রামমোহন রায়ের 'ভগবদগীতা'র পদ্যানুবাদটি। বোধহয় বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তাই রামমোহনের পদ্যের পদচারণা গীতিকবিতাবলীর পরও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান অজানার অন্ধকারে অনালোকিতই।

তবু সব না পেয়েও ইশারায় পাওয়া কবি রামমোহন রায়কে।

কবি ও কবিতার মানসিকতা রামমোহনের যথার্থ ঔপনিষদিক দর্শনের উপযোগী। আবার বলা যায় ঔপনিষদিক ঋষিরা তো যথার্থই প্রাজ্ঞ কবিই। সেই অনুভূতির কবি-মানস যেমন উপনিষদ ঋষির তেমনি তার উপভোগী কবিরও। আমরা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে দেখি সেদিনের সেই ঔপনিষদিক ঋষি কবিদের উপলব্ধিকে অনুধাবনে উভয়ের তৎপরতা। রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের সামগ্রিক চেতনাকে তো সচেতনভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অন্তরে-অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করার আয়োজন করেছেন। তিনি ঔপনিষদিক ধ্যানে ছিলেন একান্ত আত্মস্থ। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ঔপনিষদিক ধ্যানে ছিলেন মনীষায় উন্নত, উদার ও উজ্জ্বল।

এবং যথার্থ কবি-দার্শনিকের ধ্যাননিমগ্নতায় এ এক যথাযথ আনন্দমীমাংসার আশ্রয়-ভুক্তিই। যেখানে দার্শনিক উপলব্ধির কবিমানসে মিলিত হয়ে সঙ্গমতীর্থের একান্ত সফল

ফসলের কারবারী। অথবা জীবন ও জগতের যথারীতি যাত্রাপথে আনন্দব্রহ্মের স্বরূপদ্রষ্টাই রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ।

রামমোহনের যুগ এই ধারার প্রথম পলির যুগ। আর রবীন্দ্রনাথের যুগে পলির ওপরে ফের পলি দিয়ে মসৃণ পলেস্তারা পালিশ। যা ঔপনিষদিক, যা বেদ-বেদান্তের, যা ভারত-সংস্কৃতির মৌলিক কেন্দ্রবিন্দুর কথা। তবে তাকে একেবারেই বিশ্বাত্মিক বিবেকে এক যুগোপযোগী করা।

এই যুগের প্রয়োজন-ভিত্তিক উপযোগী যুগনায়ক রাজা রামমোহন রায়।

রবীন্দ্রনাথ সেই ধারারই পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরসূরির রক্ষক এবং প্রবক্তাই। সেই ধারায় স্নাত সাগ্নিক।

আমরা রামমোহনের রচনাবলীর আলোকে রবীন্দ্রনাথের আলোকিত হওয়ারই জল-জ্যান্ত এক স্বীকৃতি পাই 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪৬ সংখ্যক লেখায়। শিলাইদহ থেকে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১৯ অগস্ট লিখছেন—'এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে ; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্যলাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখর বুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন'। এই সূত্রে ডয়্সেন-সাহেব প্রসঙ্গ বলেও নিজের মনের সংশয়কে উল্লেখ করতে কার্পণ্য করেন নি। তবে স্বীকার করেছেন—'এক হিসেবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল ; কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্ডান গ্রন্থি ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে বসে আছেন ; আর কিছু না হোক, সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন সঙ্গের সাথী রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। পড়েছেন বেদান্ত ব্যাখ্যায় রামমোহন মনীষার ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু তাঁর চিন্তা থেমে থাকে নি সেখানেই শুধু তা প্রাচ্যের চেতনায় পাশ্চাত্তের বুৎপত্তিরও কথা উচ্চারণ করলো। এইখানেই রামমোহনের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে। এইখানেই প্রাচ্যচৈতন্যে পাশ্চাত্তের আলোকপাত।

রবীন্দ্রনাথ এখানেই লিখেছেন—'সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই—আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এ কথা মনে স্থান দিতে পারে—আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি অদ্ভুত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। ঐ বৈদান্তিক মতটা আজকাল য়ুরোপেও অনেকটা ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিম্বা হয়তো একটা নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসবে।' এ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীন ঔদারদৃষ্টির আলোকে বেদান্ত অবলোকন যার ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন রামমোহন বিদেশে অবস্থান করে শেষজীবনে। আর আমরা সকলেই জানি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রদীপ্ত বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রচার করলেন বেদান্ত-

ভাষ্যের বাস্তব জীবনকথা পাশ্চাত্ত্যের দিকেদিগন্তে। যার কথা রামমোহন আগে উচ্চারণ নিশ্চয়ই করেছিলেন কিন্তু জিজ্ঞাসায় যে প্রদীপ রবীন্দ্রনাথ প্রজ্বলিত করলেন তা কি বিবেক-বাণীর কথাকলির স্মরণিকায় ?।

রাজা রামমোহন রায় স্বদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছিলেন ১৮৩১ খৃস্টাব্দে। আর স্বামী বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন ৩১ মে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। এ আলোচনা এরপরই রবীন্দ্রনাথের। বিবেকানন্দ পরবর্তী পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় এ রবীন্দ্রনাথের। তাই রবীন্দ্র-চিন্তার গভীরলোকের মর্মকেন্দ্রে আমাদের অনুপ্রবেশ হলে যে বিচার প্রয়োজন তা হলো রামমোহন প্রদত্ত বেদান্ত-বাণীই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন মনোস্ক হয়েছে প্রাচ্যের সচলতা পাশ্চাত্ত্যের অচলতা বা নতুন কিছু একটা রূপান্তরের মুখে আবার না আত্ম-প্রকাশ ঘটায়! এই রবীন্দ্র-বিস্ময় সজাগ মানসিকতার প্রগতিশীলতারও নামান্তর অবশ্যই। অথবা পাশ্চাত্ত্যের বোধে বেদান্ত হয় তো প্রাচ্যজ্ঞানীর মতন বোধগম্য হবার নয়!

তবু রবীন্দ্রনাথের যে উপলব্ধিব দিগন্ত তা কবিদার্শনীকেব। তা আনন্দমীমাংসারও।

তিনি এখানেই প্রকাশ কবলেন তাই—'সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ কবা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথার্থত মুক্তিরই আনন্দ—অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দরুন দিনের বেলায় আমার যে একটা দৃঢ বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে; যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ উপলব্ধিজন্মাবে তখন যে—একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতালাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব।' রবীন্দ্রনাথেব লেখনীতে এ এক আশ্চর্য উক্তি ব্রহ্মবাদী রামমোহন-ঘরানার ঘরোয়া ব্যক্তিত্বে।

এই আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষ সূত্রবেখা সরস রবীন্দ্রনাথের। তিনি লিখলেন—'এ কথাটা আমি অতি ঈ-ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্মুক্ত জীব জগৎমুক্ত শিব—এ কথার স্মরণিকা কি?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—মায়ার হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তিই কি একমাত্র পরিত্রাণ?

কারণ তিনি তো বলেইছেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' আর তাঁর কবি-মানসে উদ্বেজিত চেতনার আলোয়-আলোয়—'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।'

শেষের দিনকে রামমোহন ভয়ঙ্কর গীতিকবিতায় বললেও ঔপনিষদিক উপলব্ধির রামমোহনকে আনন্দবাদের সূত্রসন্ধানীই তো গ্রহণীয়, সুস্থিরসিদ্ধ এবং শাশ্বত।

রবীন্দ্রনাথ এই 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৯৬ সংখ্যক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন—'ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো,' সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়।' আর ১৯৭ সংখ্যক কথায় বলছেন—'সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি

মাত্রামুপজীবন্তি।' এই সৌন্দর্যেই আনন্দ রবীন্দ্র-দর্শনে অভিব্যক্তির আরো উদাহরণ সহযোগে বিবৃত এর পরও—'সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দ-লহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম. তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে।' রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দবোধ আব রামমোহনের শঙ্করাচার্য-ভাষ্যের প্রকাশ আরেক উপলব্ধির। গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' বা শেলি ও কীট্স উপলব্ধ সৌন্দর্য-চেতনার কথা না ভেবে একটি আনন্দবোধকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে উপনীত হওয়াই অনুভবের বিষয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ সেদিনেও তা মনে এনেছেন। রামমোহন যেমন আমাদেরকে মনে করিয়েছেন ঔপনিষদিক বাণী ও বিভূতিকে।

তবে বৈয়াকরণের কালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' শেষ লগ্নে স্বল্প কথায় রামমোহন 'ছন্দ' পর্যালোচনায় উপনীত হয়েছেন। আর কবি রবীন্দ্রনাথ বহু ভাবে বহু ক্ষেত্রে ছন্দের আলোচনাকে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক প্রবৃত্তির মধ্যে গ্রহণীয় করেছেন। পরবর্তীকালে যা গ্রন্থায়িত। কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানে ব্যাকরণ-বিজ্ঞান ছান্দসিক। বইটিকে নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ শুধুই 'ছন্দ' বলে।

আর রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থেব 'বাংলা ব্যাকরণ' আলোচনাটিকে রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বিচার-বিবেচনার সাথসঙ্গত রূপেই উচ্চার্য। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বৈয়াকরণের শাব্দিক কারবারী।

সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় বৈয়াকরণকার আবার সাহিত্যসেবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্যাকরণ ভিত্তিক ছান্দসিকও। তাই উভয় দিগন্তে উভয় মনীষাব পক্ষবিস্তার মানসিকতার বিস্তৃতিব এবং বহুমুখিনতাব এ এক পরিচায়িকাও।

রামমোহন-ভাবনার ক্রমবিকাশ

ভারত-ভাবনার ঐশ্বর্যে যাঁবা যথার্থ ঐতিহ্যবান তাঁদেব মনেব কোণে জবাকুসুম-সূর্যের অরুণোদয়ের মতনই সর্বদাই হয় উদ্ভাসিত-বাণী—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি'। আনন্দ-রূপ অমৃতবাণীর বিভূতিময় মানসিকতা। বিভূতিবিস্তৃত আনন্দমানস।

এই ভারতীয় সংস্কৃতিবোধের মৌলবিন্দুতে চেতনার প্রকাশ হয় পূর্বসূরিব গঠনগৌরবের কীর্তিকর্মে। হিন্দুধর্মের সনাতনধারার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের প্রসার যা শঙ্করাচার্যের থেকে চৈতন্যদেবের বিস্তৃতির পরিক্রমা অভাবনীয় এক ভাব ও ভাবনার। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব বৈভব এককালের উজ্জ্বল কিন্তু চিরকালের সামগ্রী হয়ে ওঠেনি। কালের প্রয়োজন সাধন করেছে যথাযথই। নতুন ধারার নতুন প্রচার আকৃষ্ট করেছে ঐকান্তিক যুগোপযোগী উপস্থাপনায়। হিন্দুধারায় আশ্রয়পুষ্ট প্রকৃতির বিশ্বসমন্বয় 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবে ব্রাহ্মসমাজ গঠনের উচ্ছলতা। বিভিন্ন পথে তার কাল-পরিক্রমা হয়।

রামমোহন-অনুব্রতীর এ এক সংগঠিত প্রয়াস। রামমোহন অবশ্যই যে ব্রহ্মসাধনার কথায় সোচ্চার ছিলেন তা সঠিক আর 'আত্মীয় সভা' স্থাপনায় যথার্থ আন্তরিক পরিচয় স্থাপন করেন। কারণ তিনি অন্তরের ছোঁয়ায় আত্মীয় চাইলেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ে।

এই ধারায় ক্রমবিকশিত পরবর্তী প্রগতি।

অর্থাৎ রামমোহন রায় স্মরণীয় করে গেলেন ভারত-ভাবনার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সামগ্রিক এক উদার দৃষ্টিকে। তাঁর জীবনদর্শনে ঔদার্যের অনুভব।

এমনি বিশ্বমুখী সহৃদয়তাই রামমোহনের উত্তরাধিকার।

সেই মৈত্রী ভাবনার ধারাস্রোতে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত যার বীজাকারে চিন্তাজ্ঞান রামমোহনেরই। তিনি আমাদের মধ্যে 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'এর বিবিধের মধ্যে মিলন মহান জ্ঞান করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন চেয়েছিলেন একটি মৈত্রী পরিষদের কক্ষে। আজ তার রূপ থেকে রূপান্তর একাধিকবার হয়েও যা হয়েছে তাও এক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্যই। কারণ রামমোহনই সেই বিশ্বরাস্ট্রসঙ্ঘ সংগঠকের অগ্রণী প্রবক্তা।

আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি বিশ্বমুখী অভিযাত্রী।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে বিশ্বযাত্রার মানস-অগ্রগতি।

এবং অগ্রগামী এই এক মানস-প্রগতিরই ইতিকথা।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বলেছিলেন—'রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে।' এই বিরুদ্ধতার মধ্যেই রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততার বিকাশ ও বিস্তার। কারণ রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা'র পরিশিষ্টে বললেন—'সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে।' তাই আমাদের ভারত-ধর্মের সাধক রামমোহন এবং ভারত-পথের পথিক তিনি। তাঁর পদযাত্রা ভারত-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-উদ্ধার পথেই।

কিম্বা রামমোহনই ভারত-ভাবনার আধুনিক অগ্রদূত।

'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার'—এই প্রশ্ন রামমোহন পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের। তাঁর 'ল্যাবোরেটরী' গল্পের 'সোহিনী' চরিত্র বাংলার গল্প-উপন্যাসের নারী প্রগতির ক্রমবিবর্তনের জীবন্ত উদাহরণ।

আর রবীন্দ্রনাথের নাটকের 'বিসর্জন' বিষয়বস্তুর মৌলকেন্দ্রে যে উদার হৃদয়ের উত্তম ছোঁয়া অথবা 'গোরা' উপন্যাসের বিস্তৃত বৃহৎ পটভূমিকা, তা একটি কালের বিবর্তনকেও তো যথোপযুক্তভাবে স্মরণে আনে।

রবীন্দ্রনাথ 'অরূপ রতন' নাটকে সুদর্শনার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—'তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই

এসেছি, তোমার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।'

এ কথা তো 'অরূপ রতন' নাটকেরই পরিবেশের শুধু নয়, এ সমস্ত রামমোহন-পরবর্তী প্রজন্মেরই এবং এখানেই হয়তো-বা রবীন্দ্রসংগীত—

'সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেন তোমার বরণডালা॥'

রামমোহনকে আমাদের আত্ম-সচেতনতায় সেই বরণডালা দেওয়ার তাগিদ। আমাদের বরণীয় তিনি। স্মরণীয় তিনি। আমরা ভাবি যে, আমাদের আত্মবোধের উদ্বোধক তিনি। আমাদের আত্মজাগৃতির জাগরণ সংঘটক তিনি।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকেব পঞ্চক বলছে—'ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে। আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত; আমি আসার পর প্রায় তার সব কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।' রবীন্দ্রনাথ এ চিন্তার বুদ্ধিদীপ্তিকে রামমোহন-উত্তীর্ণকালেরই মননশীলতায় উপস্থাপিত করেন।

আর 'রক্তকরবী'র মেজো সর্দারকে বলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—'বুঝছ না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোসাঁই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারি ধর্মটা নিজেব অগোচরে পালন করতে হয়, তা-হলে নাম জপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।' রামমোহন-প্রদত্ত অবাধ মনের বাঁধন-হারার কথা. 'বন্ধনহীনগ্রন্থী'র কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' গদ্যনাটকে সতীশ বলতে পেরেছে সোচ্চার—'কাকে বিশ্বাস কর না, কাকিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে-অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—'

আমাদের কাছে এ একেবারে জটিল দুনিয়ার জালবিস্তারকে উপস্থাপন। জীবন জটিলতার বাস্তব কথা স্পষ্ট করে বলা। এই স্পষ্ট কথায় কষ্ট না পাওয়ার মানসিকতা।

রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' নাটকে কবির কণ্ঠে উচ্চারিত করালেন চিরকালের কথা—

'একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।'

সকলকেই বলরামের চেলায় ঢেলে দিচ্ছে। বলিষ্ঠতাও চাইছে যুগের প্রয়োজনে। রামমোহন সেদিনের এই দেশে বলিষ্ঠতার কথা ভাবেন এবং নিজেও ছিলেন বলিষ্ঠ।

রামমোহন-রচনার বেশ অনেকটা অংশই বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্তির। তিনি এক-দিকে গোঁড়া হিন্দুয়ানার তক্‌মাধারীর বিরুদ্ধে অপরদিকে খৃস্টান পাদরীদের বিধর্মী কল্পার বিরাগে বিষোদগার করেছেন। অথবা বলা যায়, তিনি এর বিরুদ্ধেও লেখনী-ধারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এইদিকেও নিজের সচল লেখনীকে কখনও-কখনও প্রতিবাদের হাতিয়ারও তো করেছেন। বিশেষ করে 'আত্মশক্তি' ও 'সমূহ' অংশের রচনার কথা মনে করা যায়। তাঁর স্বদেশ-ভাবনার প্রবন্ধের বিষয় তো এ ক্ষেত্রে যথাযথ চিন্তাই করা চলে।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-সচেতন ভারত-মনীষা।

রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' আখ্যানকাব্যে কবিকে দিয়ে বলাচ্ছেন—'পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।' আর তাই মাধবীর গান—

> 'এই-যে পাখির গানে গানে
> চরণধ্বনি বয়ে আনে
> বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া।'

এই নাড়া-খাওয়া মনেই 'বিসর্জন'এর বাজনা বাজে। রবীন্দ্রনাথের রঘুপতিই হয়তো বলতে পারেন তখন—

> 'দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
> পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
> মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির। তোবি কাছে
> সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!'

মূকের কণ্ঠে মুখর-বাণীর কথাই আধুনিকতার। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেরও তাই।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে সুচরিতাকে বলতে পেরেছে গোরা—'মানুষকে মারতে গেলে সে ঠেকাতে যায় কেন? তার প্রাণ আছে বলে। পাথরই সকল-রকম আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে।'

অর্থাৎ পাথর নয় সজীব মানুষের জয়যাত্রার কথা বলার মানসিকতাকে পাওয়া।

'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ 'প্রচুরতম লোকের প্রভুততম সুখসাধনের' এক প্রধান চেলা রূপে পেলেন শচীশকে আর শ্রীবিলাসকে বিশ্রী নামে ডেকেছেন। কিন্তু বোধ হয়েছে এক-দিন—'বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা' যা পার্থিব প্রাণের। আর রবীন্দ্রনাথ এখানেই সমাজজীবনে যখন ব্রহ্মবাদী, এক বিশেষ ভাবনার উদয়, তার রূপ-রেখায় নিমগ্ন হয়েছেন একাধিক স্থলে। তবে মনের কথাই মুক্তির কথা। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কথাই স্মরণীয়—

> 'যায় নাই, যায় নাই,
> নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
> তোমার আহ্বানে

উদাব তোমাব দ্বাব-পানে।

হে বাসবঘব,

বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমব।'

এই বিশ্বপ্রেমেব কথাই বামমোহন ও ববীন্দ্রনাথেব।

ববীন্দ্রনাথেব 'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থেব 'ল্যাববেটবী' গল্পেব সেই যে সোহিনী চবিত্র নাবীজাগৃতিব মুন্সীয়ানায এ এক অনন্য চযন। যে নাবী বলতে পেবেছে—'লোকে ভাবে, আমবা বন্ধুত্ব কবে থাকি স্বার্থেব গবজে।'

এমনি স্বার্থ সর্বস্ব সংসাবে নাবীজাগৃতিব চেতনায বামমোহন এবং ববীন্দ্রনাথ।

বোধ হয 'লিপিকা'ব ববীন্দ্রনাথ তাই 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' বচনায় বললেন—'সূর্যদেব, তোমাব বামে এই সন্ধ্যা, তোমাব দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদেব তুমি মিলিযে দাও।'

এই মিলনেব কথাই নবজাগৃতিব ফলোদয়।

কাবণ—'এব ছাযা ওব আলোটিকে একবাব কোলে তুলে নিযে চুম্বন করুক, এব পুরবী ওব বিভাসকে আশীর্বাদ কবে চলে যাক।'

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যেব মেলবন্ধন যুগ থেকে যুগান্তেব বাণী।

আমবা অনেকেই সেই মহালগ্নেব সঙ্গমেব স্বস্নাত। কালেব সাক্ষী হযে ভালোমন্দেব উত্তবসূবি প্রজন্মেব পব প্রজন্ম।

কিন্তু এব বুকে লেগেছে অবক্ষযেব ঢেউ। সমাজজীবনে লেগেছে ভাঙাগড়াব মাতন। অর্থাৎ এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। যাব সূচনা দীর্ঘকালেব নতুন আব পুবোনোব সংঘাত আব সংঘর্ষে। এবং এবই ভেতব থেকে আধুনিকতাব চিবন্তন বাণীটি তুলে ধবেছিলেন বামমোহন।

তিনি আবাল্য নানা ভাষা শিক্ষা কবে উদাব অ লোকে মনেব অর্গলমুক্ত অবস্থায বিচবণ কবে ফিবেছেন। তাঁব শিক্ষা বিস্তাবে ইংবেজিব প্রতি আনুকূল্য কিন্তু সংস্কৃত-শাস্ত্রেব বাংলা তর্জমায তা প্রকাশ ও প্রচাব কবালেন। তিনি যেমন হিন্দুব ধর্মগ্রন্থ তেমনি দেখছেন আবাব কোবাণও।

আব আমাদেব অদ্বৈতবাদী ধাবাকে নিযে একেশ্ববাদেব উদগীতি।

এখানে প্রান্তজনেব চিন্তায জেগেছে লোকধর্মেব প্রাচীন কথা। বিশেষ কবে আউল বাউলেব সহজিযা ধাবাব কথা। জানা যায বামমোহনেব জন্মতীর্থ এই সহজসাধনাব প্রাণভূমি। যদি আবাল্যেব সেইসূত্রেব অনুবণন মনেব কোণে কিছুটা বাসা বেধে থাকে, তা হলে কি তা স্মবণীয় নয?

নিশ্চযই লোকধর্মেব লোকাযত সমন্বয সচেতনতাকে বামমোহনেব ধাবাস্রোতে অবগাহনেব কথা বিচার্য। একক ঈশ্ববেব চিন্তাই ঐতিহ্যসূত্রেব অনুভব।

এবং ভূমিব ভবনে থেকেও ভূমাব সন্ধান—বামমোহন ধাবাস্রোতেব ব্রাহ্মধর্মেবই।

যা বামমোহন ভাবত-সংস্কৃতিব মৌলকেন্দ্রে চিন্তাসূত্রকে নিবদ্ধ বেখেই প্রতিষ্ঠিত কবলেন। এই ধাবাকে জানানোই তো বামমোহনেব নবজাগবণ-বাণী। এবই চেতনায় আমাদেব নব যুগেব আধুনিকতা।

রামমোহন-রচনাবলীর আদিরূপের সন্ধানে আমরা দেখি তিনি বহু ক্ষেত্রে ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এইদিকে আমরা আবার রবীন্দ্রনাথকেও অনুরূপ ছদ্মনামের আত্মগোপনে গদ্য রচনার প্রচারক হতে দেখি। উভয়ের ছদ্মনামের গ্রহণে কিন্তু স্বদেশের আদত রূপকে তুলে ধরাই আসল উদ্দেশ্য হয়। স্বদেশই স্বনামে বর্তমান থাকে।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশব্রতীই মৌল ভাবনায়। আর তা আধুনিকতার জয়যাত্রায়। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে ভাসা তরী ॥'

তবে সেই আধুনিকায়নে রামমোহন ছিলেন বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবাহের প্রবক্তা। তাঁর সতীদাহ বন্দের প্রচেষ্টায় মানস অনীহাকে তিনি প্রাধান্য দিলেন নারীর প্রতি মর্যাদায় ও স্বাধীন অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করায়। ইংরেজি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে আধুনিক বিশ্বের দরবারে দেশের মানুষকে উপনীত করতে চাইলেন। বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ করার পরিকল্পনা জাগালেন। আর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বীজ রোপণ করলেন রামমোহন। তাঁর কালে এ এক অভাবনীয় অগ্রনায়কের ভূমিকা। ঠিক জানা যায় না তাঁর আগে এমন চিন্তা আমাদের কেউ কি আর করেছিলেন ?

আর ভাষাবিদ রামমোহন প্রসঙ্গে ভাবতে বসলে বলতে হয় হরিনাথ দের পথপ্রদর্শক হয় তো আদি রামমোহন রায়। তিনি বহু প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন যেমন চলতি ভাষাও অনেক শিক্ষা করেন। আর সেই সব ভাষার ধর্মজ্ঞানকে নিয়ে তিনি বিশ্বধর্মের প্রবক্তা হয়েছেন। তাই তিনি ভাষাবিদ আর ধর্মের বিশ্বাত্মবোধে এক মহান অধিনায়ক। কিন্তু ভুলে গেলেন না বক্তব্য উপস্থাপনে বলিষ্ঠ গদ্যের প্রবর্তনে। তাঁর হাতেই গড়ে উঠলো প্রথম বাংলা গদ্যের বনিয়াদ। আর এ সবই সমাজসংস্কারক রামমোহনের পথের পাথেয়। তিনি একদিকে যা ভাবছেন তা দেশেরও কল্যাণে আর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বেরও চলতি দুনিয়ার অনুকূলে। তাই তিনি স্বজাতির স্বদেশের আর বিজাতির বিদেশের বিশ্ববৈদগ্ধের বিবেক মহান।

অথবা আমরা ভাবতে পারি ভারত-ভাবনার ঐক্যবোধের সাধনাকে রামমোহন বিশ্বমুখী অভিনিবেশে উপস্থাপন করলেন যখন পূর্ব আর পশ্চিম 'দিবে আর নিবে'। এই লেন-দেনের পর্যায়ে। রামমোহন সঠিক সময়ে এসে ভারত-ভাবনায় বিশ্বচেতনার স্পর্শ ছুঁইয়ে দিলেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভলগ্নে 'তুওফাতুল মওহ্‌দীন' প্রকাশ করলেন। আর দেখালেন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঐক্যও আছে। সেই ঐক্যকেও গ্রহণ করা ভারত-ভাবনার কথা।

আর তাঁর মতাদর্শের মৌলবিন্দুতে ভক্তি আর যুক্তির হলো মেলবন্ধন। তিনি ধর্মের প্রচারে ভক্তি ও যুক্তিকে সজাগ রাখলেন সমসূত্রে। এইখানেই সনাতন ধর্মধারায় এ এক নবতর রামমোহনের আদর্শ অবদান।

তবে ঔপনিষদিক রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করলেন আত্মজ্ঞানের ও আদর্শনিষ্ঠার ব্যক্তিত্ব-বোধকে। অর্থাৎ মানুষকে রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় মান সম্পর্কে হুঁশকে জাগ্রত করতে চাইলেন। আবার বৌদ্ধের আত্মদীপকে প্রজ্জলিতও করতে চাইলেন। অর্থাৎ রামমোহন

আত্মবোধে বিশ্বাত্মবোধকে আমাদের চির জাগ্রত করলেন। উপনিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের—তাই রামমোহন প্রচার করেছিলেন। তাই তা রবীন্দ্রনাথও উদ্ধৃতি দিয়েছেন বারবার—

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি/ সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।'

সর্বমানবের ঐক্যসূত্রকেও বৈচিত্র্যের মধ্যেই পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে চলাচলই রামমোহন রায় প্রদর্শিত জীবনচর্যা। যা তাঁর কালের প্রয়োজনে হয়েও এবং চিরকালেব প্রয়োজনে। অথবা বলা যায় যে, তিনি যা যাকে প্রকাশ করলেন তা আধুনিক সমাজজীবনের উপযোগী করেই।

এই আধুনিক সমাজ উপযোগী পরিবেশনই রামমোহনেব বড় অবদান।

সেটা আসলে বোধের পরিচায়ক। তিনি হিন্দুধর্মেব বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও এক ব্রহ্মবাদ। ইসলামীয় উদার সমদৃষ্টি। খৃস্টের মানবপ্রেম। এই সবকে নিয়ে তাঁব বিশ্বজনীন মানবধর্ম। যা তাঁর চিন্তায় ছিল ধর্মের বিরোধ মীমাংসার পথ রূপে। যাকে যথার্থই বিশ্বধর্মের মর্যাদাদান করা যায় আমাদের উদারবোধে।

এরই পরের যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, নরনারীর সমান মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা সমাজ-জীবনে। এ কথা কি করে ভাবা যায়? এ কথা তখনই ভাবা যায়, যখন মনে আসে সতীদাহ প্রথা রদের স্বভাব মানসের সংগঠনে রামমোহনের উদ্যোগের ছবি ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে প্রবক্তারূপে রামমোহন চাইলেন নারীকে স্বামীর এবং পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায়। আর কন্যাবিক্রয়, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ বা এমনি অন্যায়কে বরদাস্ত করেন নি রামমোহন। যেখানে ছিল রামমোহনের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা।

অনেক সময়ই আমরা আধুনিক সংবাদপত্রের স্বাধীন মতবাদের কথায় সোচ্চার হই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতির শীর্ষস্থানীয় পুরুষ ছিলেন রামমোহন। নিজের কাগজ সম্পাদনেব কালে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর চিন্তায় সংবাদপত্র হবে মুক্তকণ্ঠ। হবে সমাজের সামাজিক মুখপত্র যথার্থ অর্থে। অথব, এ বলা যায়, হবে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। 'মিরাট উল-আকবর' পত্রে আয়র্লণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামকে একান্ত শুভেচ্ছা দেন। দেন স্বাধীন দেশের অস্তিত্বে জয়োচ্ছ্বাস।

গ্রামবাংলার জমিদার মানুষ রামমোহন। ইংরেজের ভারত-রাজধানী কলকাতার নাগরিক হলেন। কিন্তু ভুলতে পারলেন না গ্রামীণ অর্থনীতির চিন্তাকে। তাঁর ভাবনায় গ্রামের কৃষকদের সমস্যার কথা জাজ্বল্যমান হয়। তিনি অর্থ নৈতিক ও শাসননৈতিক উভয় দিকেই কৃষকের কল্যাণ কথা ভাবলেন। জমিদারের অত্যাচার-মুক্ত কৃষিসমাজ চাইলেন। তাদের অর্থনীতির কথাকে রাষ্ট্রীয় ভাবনার বিষয় করতে আগ্রহী হলেন। কৃষক-দরদী ভূমিকা তাঁর এখানে। ক্ষেতের ফসল বিক্রয়ের সময় চাষীর কাছ থেকে হাটে তোলা তোলারই রেওয়াজকে সীমিত করতে চেয়েও আন্দোলন করেন রামমোহন রায়।

আর বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় জুরি প্রথার প্রবর্তনে প্রস্তাবিত হলেন। বহুজনের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্তকে বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্থাপিতও হয়।

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতে সর্বতঃমুখী আত্মপ্রতিষ্ঠারই বহুমুখী দিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। তিনি সপ্রতিষ্ঠায় ভারতীয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর আন্তর্জাতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই স্মরণ করান সবাগ্রে। এবং পাসপোর্ট প্রথার বিরুদ্ধে মত দেন ফাঁন্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁলেরাঁ সাহেবকে তখন লেখা এক চিঠিতে।

আচার-অনুষ্ঠান পালনরীতি ও পুজোপদ্ধতির মধ্যে ধর্মকে শৃঙ্খলিত না রেখে মুক্তির খোলা হাওয়ায় ধর্মকে স্থাপন কবলেন রামমোহন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম যথাযথ অর্থে সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় প্রবক্তা।

এই সমন্বয় ও সমঝোতা, এই মানবতা ও আত্ম-চেতনা, এই কল্যাণমুখী ও একাত্মতা— রামমোহনের জীবনব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতি বা ফলাহার। যার প্রসাদে আমরা উনিশ শতককে স্বর্ণ অধ্যায় রূপে পেয়ে এই বিংশ শতকে শত নাম গান করেছি ফেলে আসা শতাব্দীব গর্বে। যাব প্রধান পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ই। যিনি একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যবান অন্যদিকে আধুনিকতার অনন্য অগ্রদূত। তাঁর ঔপনিষদিক দীক্ষা আবার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের প্রতি সমীক্ষা।

এই বোধকে বুঝেছিলেন উনিশ শতকের মনীষীমানস। তাই সে যুগের মানসপটে বিশ্বের এক উদার উপস্থিতি। সেখানে রবীন্দ্র-মানস-চিন্তাব সঙ্গে অনেকেবই কথা আসে। তাঁরা উদ্বোধিত রামমোহন-চেতনায়! তাঁদের চিন্তার চৈতন্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। তাঁরা স্বর্ণোজ্জ্বল করেছেন সমগ্র শতাব্দীকেই। যাকে ধরা যায় রামমোহন ভাবনারই ক্রমবিকাশ রূপে।

আমরা জানি রামমোহন উপনিষদ তথা বেদান্ত প্রচারে তৎপব ছিলেন দেশী ও বিদেশী ভাষায়। তাই পাশ্চাত্য দেশের বেন্থাম, এমার্সন, থোরো, রকো বা ম্যাক্সমুলার প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদরা রামমোহনের অনূদিত বেদান্ত-উপনিষপাঠেব সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা জানতে পারেন ভাবত-ভাবনার কথা। আর রবীন্দ্রনাথ তো বটেই যা বহু মনীষারও ভাগ্যোদয় ঘটায়। আমরা কি ভাবতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কথা? তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত থাকতেন সিমলায়, যেতেন ব্রাহ্ম সমাজে। তাঁব সময়ে তো রামমোহনেব অনূদিত বেদান্ত-উপনিষদ প্রচারিত থাকাই স্বাভাবিক। আমরা কি ভাবতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজ থেকে সেদিনের নবেন্দ্রনাথ দত্ত উপনিষদের পাঠ গ্রহণ করছেন রামমোহন অনূদিত গ্রন্থেই? তিনি পাঠ করছেন কি 'বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদান্তসার'? কেনোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং ভগবদগীতার পদ্যানুবাদ—যা রামমোহন প্রকাশিত, তা কি পাঠ করেছেন সেদিনের নরেন্দ্রনাথ দত্ত! অথবা বলা যায়, ভাবী স্বামী বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্পর্শ পেয়েছিলেন বেদান্ত-উপনিষদের হয়-তো-বা রামমোহন অনুবাদেই! আজ আমাদের এ অনুমান, আমাদেরই থাক তবে বেদান্তবাদী মানসে রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই উজ্জ্বলরেখায় উদ্ভাসিত ছিলেন। জাগ্রত-চেতনায় উদ্বোধিত ছিলেন।

আর সেই বনিয়াদ নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খৃস্টাব্দের ছাব্বিশে মে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে, সূচনা বক্তব্যেই বলতে পেরেছিলেন—'গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খৃস্টান জগতে নিউ টেস্টামেণ্টের মতো ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক; কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ কোন ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়, ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'উপনিষদ' শব্দের একটি অর্থ—(আচার্যের নিকট) উপবেশন।' এই উপবেশন আধুনিক কালে আমাদের উপনিষদ জানায় রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদ প্রকাশের সান্নিধ্যে। তিনিই প্রশস্ত করেছেন গৌড়জনকে সুপবিত্র এক সুধানিরবধি পানের।

এবং বিবেকানন্দকে এমন আগ্রহী করে যে, তিনি বলছেন—'প্রাচীন সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি খৃষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেকার—ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।' তিনি উপনিষদের রচনাকালের সীমানির্দেশেও আগ্রহ নিয়েছেন আর বলছেন—'উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক-ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।' এ কথায় মৌলভাবে ব্যাখ্যার আগের এ এক সামগ্রিক উপলব্ধির বিষয়কে উপস্থাপনা।

এই বক্তৃতায় বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন—'হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ।' তেমনি আবার বলেছেন—'ক্রমশঃ এই সব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞকেই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা একটি অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন; যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী।' এই শব্দমন্ত্রেই নিযুক্তি এরও এক আচার সর্বস্ব পরিণতিরই কথা দেখলেন রামমোহন। তারই তো বিরূপতায় সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর বেদান্তের মূল বক্তব্যে এই মানসিকতাকে উপনীতকরণ। মানসিকতার উন্নয়নে বিবেকানন্দও তাই। তিনি বললেন—'তুমি এক মুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারো, কিন্তু তুমি ঈশ্বর হইতে পার না—বিপদ এইখানেই।' বিবেকবান রামমোহন রায় ও বিবেকবান স্বামী বিবেকানন্দও। তিনি ঐ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতার শেষে যতিরেখা টানেন এই বলে—'যখন যেখানে একজন অপরকে দেখে না, যেখানে সবই এক,—সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অসুখী হওয়ারও কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই—'একমেবাদ্বিয়ম্'। কাজেই ভয় করিও না; ওঠ, জাগো, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত থামিও না।' বিবেকানন্দের এই 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীর আগেই 'একমেবাদ্বিয়ম্' একেবারে রামমোহন-মানসের ছোঁয়া-ছুঁয়িই ঘটিয়েছে। আর গতিশীলতায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেও—'হেথা নয়, হেথা নয়

অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' রবীন্দ্রনাথের বলাকায় পলাতকা প্রাণ।

স্বামী বিবেকানন্দ মিসেস্ ওলি বুলকে ১৯০১ খৃস্টাব্দের ছাব্বিশে জানুয়ারির চিঠিতে একটা কথা সেদিন উচ্চারণ করেন যা ভেবে দেখার। তিনি বলছেন—'নূতন শতাব্দী এসেছে, কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, বরং স্পষ্টই তা ঘন হয়ে উঠছে।' এইবোধ নিয়ে রামমোহনের নবজাগৃতির উদগীতি আবার পরবর্তীর মনীষী মিছিলেও তারই কণ্ঠস্বর। 'বর্তমান ভারত' বিষয়ের আলোচনায় বিবেকানন্দ বললেন—'চার্বাক,জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।' এই অভাব-পূরণই রামমোহন থেকে পরবর্তী প্রজন্মের পূর্তিচিন্তা। অথবা বলা যায় চিন্তার প্রগতি।

আসলে রামমোহন থেকে বেদান্তের বনবাণী শহরতলীর বুকে বিবর্তিত হয়ে হয়েই যুগোপযোগী রূপায়ণে বিকশিত হয়ে উঠলো। উঠলো তা যুগের হাওয়ায় যুগান্তের দিকে। এবং তা যুগের প্রয়োজনে যুগোপযোগী-রূপেই।

অর্থাৎ রামমোহন-যুগের সূচনা হলো এবং রামমোমন হলেন যুগনায়ক।

নবজাগৃতির যুগ রামমোহন-যুগ, নবজাগ্রত চেতনাই যুগনায়ক রামমোহনের।

এই এমনি দিনেই রবীন্দ্র-কথা মনে আসবে—

'জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের আশা—
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই॥'

ভাসমানতায় চলোর্মি গতিই আশাবাদিতা। এবং জাগৃতির।

জাগরণ-দীপ প্রজ্বলনই রামমোহনের অগ্রণীব প্রদীপ্তি। সেদিনে তিনি জাতীয়-জাগৃতিব প্রভাতীলগ্নকে দেশের সীমায় অসীমতার দিশা দিলেন। তাঁর উদ্যমে ও উদ্বোধনে বিশ্ব-বিবেক নিয়ে বিশ্বমুখী উদার মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটে। ঘরে-পরে আত্মীয়তাবোধের আবেগ। সংগঠিত আন্দোলনে স্বাধীন চিত্তের জয়যাত্রা। প্রার্থনায়—জয় হোক নবজাতকের—অভীপ্সিত। অভীপ্সায় চিত্তে বিবেক-জাগৃতি।

নারী প্রজন্মের সার্থকতায় রামমোহন, নারী প্রগতির উদ্গীতিকার রামমোহন, সামাজিক বন্ধনমুক্তির ঘোষক রামমোহন। তাঁর সমগ্র জীবন মানবতার স্বাধীনচিত্তের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নাম। তিনি ভারতীয় নবজাগৃতির স্বর্ণ-যুগের যথাযোগ্য জাগৃতিকার—আগামী প্রজন্মের আদর্শ নীড়।

নীড়েই নারী ভিড়ের নারীও হয়েছে রামমোহনের জাগৃত চেতনার কল্লোলে কল্লোলে সেকালীন বঙ্গসমাজে। বঙ্গসন্তান কুসংস্কার মুক্তির মানসিকতাকে অর্জন করেছে রামমোহনীয় ভাবনার উত্তরাধিকারে। এবং আগামী প্রজন্মেও এই ভাবনার দোলায়-দোলায় দোলায়িত হয়ে বলার—'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥'

এই জয়-ইচ্ছেরই রবীন্দ্র-ভাবনার মৌলবিন্দু একান্ত মহত্তের বৃহৎ-স্পর্শে। তিনি বলতে পারলেন তাই—

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥'

স্বদেশীয় মন্ত্রেও বিশ্বময়ের মন্ত্রণা।

রামমোহন বিশ্বমুখী হয়েও স্বদেশ মুখিনতার প্রবক্তাপুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি বললেন—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

এবং ভালোবাসায় আপামর সাধারণও অন্তর্ভুক্ত। তিনি গাইছেন—

'ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়া-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥'

রবীন্দ্রনাথের গ্রামবাংলার দরদীমানস এই, আবার আমরা রামমোহনকেও দেখি চাষীর অর্থনীতির চিন্তার কথায়।

তবে সব থেকে যা মনে রাখার তা হলো রামমোহন রায়ের আত্মশক্তিতে আত্মস্থ থাকার চেতনা। রবীন্দ্রনাথের গানে তাই বলা—

'আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না॥'

রবীন্দ্র-দীক্ষা গ্রহণের সময় মনে আসে আমাদেরই ব্যক্তিজীবনের শঙ্কাকে তুচ্ছ করে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকার কথাই।

কিন্তু রামমোহনের শেষ সেই যে সময়ের একক অবস্থার কথায় আমাদের রবীন্দ্র-সংগীতের ধ্বনি মাধুর্যই শ্রুতি মুখর হয়ে ওঠে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'

এই একলা চলারই পথিকবর, আমাদের চিরকালেরই প্রতিটা দেশের চিরনমস্য। চিরকালীন প্রণম্যব্যক্তিত্ব।

'রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহা ধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে...।' এই কথার মধ্যে দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'আত্মচরিতে' যে অকপট স্বীকারে আমাদের সত্যকথনের প্রমাণপত্র রাখলেন, সে কথা মনে রেখেই ভারত-ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহনের আধুনিক অবদানের একদিক ভাবার। অন্যদিকে স্বদেশ মুখী থেকে বিশ্বমুখী রামমোহনকে গ্রহণ করার।

তিনি পান্থজনের সখা হয়ে ভারত পথিক থেকে বিশ্বপথিক। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের তেইশে নভেম্বর মতনই সময়ে রওনা দিলেন বিলেতের তীরে। তাঁর আগের কথা স্মরণীয় যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত। তিনি বলেন রাজা রামমোহন রায়ের বিলেতে এই যাত্রার আগে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসেন। সে কথা প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় কলকাতার অভিজাত ব্যক্তিদের এমন ভিড় হয়ে ওঠে যে, সিঁড়িতে পর্যন্ত জনতার জটলা জমে। এ কথায় সেদিনের সমকালীন মানসে রাজা রামমোহনের জনপ্রিয়তার দিকটিকেও অনুধাবন করা যায়।

আর ১৮৩১ খৃস্টাব্দের আটুই এপ্রিলে বিলেতের মাটিতে পদার্পণ করলেন। তখন কিন্তু তাঁর সুনাম সেখানেও পেঁাছিয়ে গিয়েছে সুহৃদতুল্য নানানবিশিষ্ট ইংরেজজনের লেখার মধ্যে দিয়েই। সে কথাটুকু কুমারী কার্পেণ্টার মনীষার কল্যাণে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জানার সুযোগ হয়। এই দিক দিয়ে তিনি স্বদেশী এবং বিদেশী সজ্জনের কাছেই হয়ে উঠেছিলেন আদরণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, মননশীল, সামাজিক সহৃদয় এবং পরপোকারী মনীষী ব্যক্তি। এবং যার স্বীকৃতি দেশে এবং বিদেশে।

আমরা এই ঘরের মহান ব্যক্তিকে অন্য ঘরের চারদেওয়ালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেখি। তিনি ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের সাতাশে সেপ্টেম্বর সে দেশে স্টেপলটন্ গ্রোভ গৃহের আশ্রয়েই নিয়েছিলেন শেষশয্যাটিকে। হুগলীর রাধানগরের প্রজাত পুরুষ প্রয়াত হলেন বিলেতের বিদেশবিভুঁইয়ে।

তাঁকে মনে করলেই মনে আসে রবীন্দ্রসংগীত 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার' করার বাণীবিভূতি। এমনই এ এক আমাদের উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিস্তৃত দিগন্ত— যাঁদের মধ্যেরই আমাদের দেশের মনীষী রাজা রামমোহন রায়। যাঁকে মনে রেখে বলার এই মানস-অভিসার হবার—

'তিমির বিদার উদার উভ্যুদয়. তোমারি হউক জয় ॥'